আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল ■ বর্ষ ১ ■ সংখ্যা ২ ■ জুন ২০২৬ www.al-ummah.org

সংকটাপন্ন বিশ্ব

ফিলিস্তিন, বহুমাত্রিক সঙ্কট এবং নৈতিক ব্যবস্থার পতন

অর্থনীতিতে স্ট্যাগফ্লেশনের মুখোমুখি বাংলাদেশ

নাকবা দিবসঃ জায়নবাদী রাষ্ট্রের অবস্থা এবং ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার

ফুয়াত সেজগিন : ইসলামি বিজ্ঞানের ইতিহাস পুনরুদ্ধারকারী ব্যক্তি

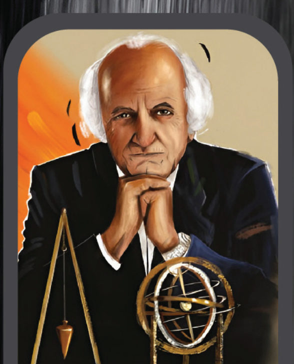

আল-উম্মাহ
www.al-ummah.org

প্রবন্ধ জমাদানের নির্দেশিকা

আল-উম্মাহ এমন সু-লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানায় যা গভীরতা, স্পষ্টতা এবং বিশ্লেষণধর্মী দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সুসংগঠিত বিশ্লেষণ ও শক্তিশালী প্রেক্ষাপটগত বোঝাপড়া থাকতে হবে। আমরা বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, মুসলিম বিশ্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিস্তৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর নিয়ে অবদান আহ্বান করি। জমা দেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত শর্তাবলী লক্ষ্য করুন:

- প্রবন্ধটি ১,০০০ থেকে ১,৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে এবং পরিষ্কার ও পরিমার্জিত বাংলায় লেখা থাকতে হবে।
- এতে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত মতামত থাকতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।
- এটি অবশ্যই মৌলিক এবং পূর্বে অপ্রকাশিত হতে হবে। তথ্যের যথার্থতা, যথাযথ সূত্র প্রদান এবং বৌদ্ধিক সততা বজায় রাখার দায়িত্ব লেখকের।
- জমা দেওয়া সকল লেখা সম্পাদকীয় পর্যালোচনার আওতায় যাবে।
- স্পষ্টতা, শৈলী এবং দৈর্ঘ্যের জন্য প্রবন্ধ সম্পাদনার অধিকার আল-উম্মাহ সংরক্ষণ করে।
- প্রকাশ নিশ্চিত নয়।
- জমা দেওয়ার সময় লেখকের পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্তর্ভুক্ত করুন।
- জমা পাঠানোর ঠিকানা: info@al-ummah.org

কপিরাইট নোটিশ

আল-উম্মাহ ওয়েবসাইট এবং এর মুদ্রিত ও ডিজিটাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ ও বিষয়বস্তু প্রযোজ্য কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত এবং আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের বৌদ্ধিক সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত।

অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, এই প্রকাশনার কোনো অংশ পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ, বা কোনোভাবে প্রেরণ করা যাবে না– তা ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে হোক না কেন।

লেখা জমা দেওয়ার মাধ্যমে লেখক স্বীকার ও সম্মত হন যে, গ্রহণ ও প্রকাশের পর প্রকাশিত উপাদানের কপিরাইট আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে থাকবে। পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সংশ্লিষ্ট লেখকের নিজস্ব এবং তা ফাউন্ডেশনের মতামতের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে মিল নাও থাকতে পারে।

বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের নিরন্তর অভিযাত্রা

‘আল-উম্মাহ’-এর উদ্বোধনী সংখ্যাটি মুসলিম বিশ্বসহ এর বাইরেও এক বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর মাঝে অত্যন্ত উষ্ণভাবে সমাদৃত হয়েছে–যার মধ্যে রয়েছেন শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, তরুণ পেশাজীবী, সামাজিক নেতৃত্ব এবং গভীর চিন্তনশীল ব্যক্তিবর্গ।

ক্রমবর্ধমান অস্থির ও অশান্ত এই পৃথিবীতে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এটি ছিল আমাদের একটি বিনীত প্রচেষ্টা। এই উদ্যোগের পক্ষে আমরা যে আশাব্যঞ্জক সাড়া ও মতামত পেয়েছি, তা এর সময়োপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তাকেই পুনর্বার প্রমাণ করে। এমন এক সময়ে যখন অগভীর ও চটকদার মন্তব্য জনপরিসরকে শাসন করছে, তখন এই জার্নালের গভীরতা, সূক্ষ্মতা এবং সভ্যতার প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে পাঠকেরা গভীরভাবে মূল্যায়ন করেছেন। এই সাড়াবোধ আমাদের সেই মূল লক্ষ্যকেই সত্য প্রমাণিত করে, যা নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম–মুসলিম সমাজে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার পুনর্নির্মাণ। প্রথম সংখ্যাটিতে মূলত কিছু মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছিল–যার মধ্যে ছিল বৈশ্বিক রূপান্তর, চিরায়ত ইসলামি চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা, ভূ-রাজনীতির নৈতিক দিক এবং ঐতিহ্য ও আধুনিকতার পারস্পরিক মেলবন্ধন।

সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের এই দ্বিতীয় সংখ্যাটি পূর্বের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সমসাময়িক প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর ওপর আরও গভীর ও নতুন মাত্রার আলোচনার পরিধিকে বিস্তৃত করেছে।

এ সংখ্যার প্রধান নিবন্ধ “সংকটে বিশ্ব” (A World in Crisis)-এ মানব সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু রূপ এবং এর পেছনের সম্ভাব্য কারণগুলোর একটি সামগ্রিক চিত্র (tour d’horizon) তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিশেষ নিবন্ধে খতিয়ে দেখা হয়েছে, সামগ্রিক অগ্রগতির মাঝেও দেশটিতে আর্থিক খাতের পেশাদারদের কীভাবে এক আশঙ্কাজনক ঘাটতি তৈরি হয়েছে। “কাশ্মীরঃ ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতি” (Kashmir: Broken Promises) নিবন্ধে ইতিহাস হাতড়ে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে–কোথায় এবং কীভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার এই ভূস্বর্গকে নিয়ে সমীকরণগুলো ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল। পাশাপাশি, ‘নাকবা দিবস’ (Nakba Day) নিয়ে লেখা নিবন্ধটি জোরালোভাবে এই বার্তা দেয় যে, ফিলিস্তিনের ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়টি এখনো শেষ হয়ে যায়নি এবং নিজেদের মাতৃভূমি ও অধিকার ফিরে পাওয়ার পূর্ণ অধিকার ফিলিস্তিনিদের রয়েছে।

যেহেতু শ্রেষ্ঠ মানবদের অবদানের ওপর ভিত্তি করেই সভ্যতা গড়ে ওঠে, তাই এই সংখ্যায় আমরা তুলে ধরেছি প্রখ্যাত প-িত ফুয়াত সেজগিনের অনুপ্রেরণামূলক জীবনগাথা, যিনি ইসলামি বিজ্ঞানের ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। এর সাথে রয়েছে সুফি কবি ইউনুস এমরের জীবনকাহিনী, যিনি মানবপ্রেমে মগ্ন থেকে আজীবন ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং আধ্যাত্মিক সম্প্রীতির বাণী ছড়িয়ে গেছেন। আরও রয়েছে টিমোথি উইন্টারের ইসলাম গ্রহণের এক আবেগঘন অভিজ্ঞতা এবং কীভাবে তিনি পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামি আধ্যাত্মিকতা ও ঐতিহ্যের আলোচনাকে একটি পরিপক্ব রূপ দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তার বিবরণ।

“কাবা শরিফের দরজা” (The Kaaba Door) নিবন্ধে এই পবিত্র দরজার বিরল ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং এর চারপাশের কিছু আকর্ষণীয় তথ্য অন্বেষণ করা হয়েছে। “আমেরিকায় মুসলিম ঐতিহ্য” (Muslim Legacy in the Americas) আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় অতীতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে। অন্যদিকে, “নাইজেরিয়ায় ইসলামি শিক্ষা” (Islamic Education in Nigeria) নিবন্ধটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিম-লে সেখানকার মানুষের জীবনে এই শিক্ষার ধারাবাহিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে আলোকপাত করে। “ইসলামি রাষ্ট্রের সন্ধান” (Quest for an Islamic State) নিবন্ধে লেখক একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের খোঁজে তাঁর নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক সফরের অভিজ্ঞতা ভাগ করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রাজনৈতিক পরিম-লকে সর্বদা উন্মুক্ত, অংশীদারিত্বমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে–যা সবার জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ তৈরি করবে। এ ছাড়া, প্রায় পনেরো বছর আগে পবিত্র মক্কা নগরীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনাগুলোর চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে আমরা এই সংখ্যায় পুনরায় “মক্কা সনদ” (Makkah Charter) প্রকাশ করেছি।

সর্বোপরি, জ্ঞান অন্বেষণ, ন্যায়বিচার এবং সভ্যতার বিকাশের মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে–মুদ্রিত সংস্করণের শৈল্পিক উৎকর্ষতা এবং গতিশীল ডিজিটাল প্রচারণার সমন্বয়ে একটি বহুমুখী উদ্যোগ হিসেবে ‘আল-উম্মাহ’ তার এই বিকাশমান অভিযাত্রা অব্যাহত রাখবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই সূচনা লগ্নে আমরা পাঠকদের কেবল নিষ্ক্রিয় ভোক্তা হিসেবে নয়, বরং এই বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রার একজন সক্রিয় সহযাত্রী হওয়ার আহ্বান জানাই। মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার এই পুনর্গঠন কেবল একটি জার্নাল বা ছোট্ট একটি সম্পাদকীয় প্যানেলের পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি অবিচ্ছিন্ন যৌথ প্রচেষ্টা–যার মধ্যে নিহিত রয়েছে জীবনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ধারণাসমূহকে লেখা, পড়া, সমালোচনা করা, বিতর্ক করা এবং সর্বোপরি তা বাস্তবায়ন করা।

প্রধান সম্পাদক

আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ জাকির হোসেন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মাসুমুর রহমান খলিলী

আল-উম্মাহ, একটি মাসিক জার্নাল, বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় পাওয়া যায়। প্রিয় লেখকবৃন্দ, আপনারা সমসাময়িক বিষয়াবলী, ইসলামী বিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা, ইতিহাস, এবং জননীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। আমরা ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় ১৩০০ শব্দের অনধিক মৌলিক ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানাই। প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:
info@al-ummah.org
www.al-ummah.org

مؤسسة الأمة
AL-UMMAH FOUNDATION

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনস (বিআইসিআরডি)
ঢাকা, বাংলাদেশ

মূল্য : ৫০ টাকা

বর্ষ ১ | জুন ২০২৬ | সংখ্যা ২

মুসলিম ঐক্য জোরদার করতে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ — পৃ. ৪

১৬ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে : পিছিয়ে পড়ছে আর্থিক খাতের দক্ষ জনশক্তি

২৪ কাশ্মীর : যেখানে সমাহিত হাজারো প্রতিশ্রুতি

২৬ ফুয়াত সেজগিন : ইসলামি বিজ্ঞানের ইতিহাস পুনরুদ্ধারকারী ব্যক্তি

৩৩ টিমোথি উইন্টার : ইসলামী ঐতিহ্য ও আধুনিক ব্রিটেনের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী পণ্ডিত

৩৬ শাহ্ আবদুল হান্নান: বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন প্রবাদপুরুষ

৩৮ কেন একটি নতুন ইসলামিক ওয়েবসাইট ও ম্যাগাজিন

৪২ ইউনুস এমরে : তুর্কিদের অনুপ্রেরণাদায়ী এক মরমি কবি

সংকটাপন্ন বিশ্ব : ফিলিস্তিন, বহুমাত্রিক সংকট এবং নৈতিক ব্যবস্থার পতন — পৃ. ১০

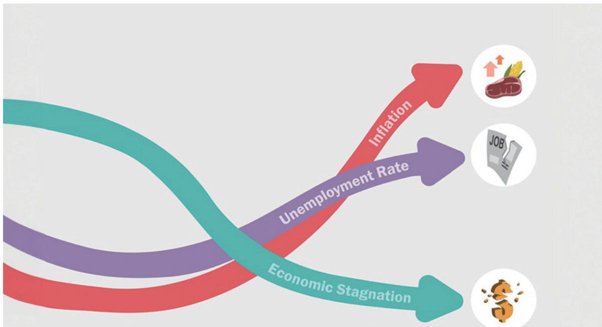

অর্থনীতিতে স্ট্যাগফ্লেশনের মুখোমুখি বাংলাদেশ পৃ. ১৯

৪৫ ডিজিটাল অপপ্রচারের তাত্ত্বিক ভিত্তি : ম্যাজিক বুলেট থেকে ফেসবুক অ্যালগরিদম

৫০ ইসলামী রাষ্ট্রের অনুসন্ধানে

৫৪ আমেরিকায় মুসলিম ঐতিহ্যের গোপন উত্তরাধিকার

৫৭ নাইজেরিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও জাতি গঠনের অনুসন্ধানে ইসলামি শিক্ষা

৬১ বিশ্বজুড়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বাস্তবতা : বর্তমান ও ভবিষ্যত

৬৪ কাবা শরিফের দরজার ইতিহাস

৬৮ ইসলামে গণতন্ত্র

৭০ দায়িত্বশীল ও নৈতিক গণমাধ্যমের সনদ

নাকবা দিবস, জায়নবাদী রাষ্ট্রের অবস্থা এবং ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার পৃ. ৩১

প্রতিবেদক

মোহাম্মদ নাসির জাভেদ

প্রকৌশলী মোহসিউ মিনহাজ নিলয়

গোলাম নবী ফাই, পিএইচডি

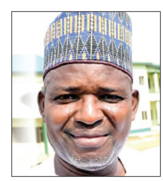
ড. বুসারি কেহিন্দে কামোরুদ্দিন

প্রফেসর নাফিসা দৌইদা

এসসাম মুহাম্মদ আল-শাহাদাত

মাসুমুর রহমান খলিলী

শাবান আব্দুল রহমান

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ

"ন্যায়বিচার, মানুষের মর্যাদা এবং সার্বজনীন নৈতিকতার প্রতি আধুনিক সভ্যতার যে অঙ্গীকার—তার জন্য ফিলিস্তিন আজ এক চূড়ান্ত পরীক্ষা।"

– মোহাম্মদ জাকির হোসেন, চেয়ারম্যান, আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন

আল-উম্মাহ রিপোর্ট
ঢাকা, মে ২০২৬

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং 'আল-উম্মাহ জার্নাল'-এর প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী ইসলামি স্কলারশিপ শক্তিশালীকরণ, মুসলিম ঐক্য প্রবর্ধন এবং ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে বৈশ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাদের উচ্চপর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষামূলক ও মানবিক কার্যক্রম জোরদার করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সফররত মোহাম্মদ জাকির হোসেন ঢাকায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে অংশ নেন, যা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়:

১. ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
২. শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত উদ্যোগ
৩. গণমাধ্যম ও প্রকাশনা বিষয়ক কার্যক্রম
৪. আন্তর্জাতিক গবেষক ও স্কলারদের পারস্পরিক সহযোগিতা
৫. ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম (আল-কুদস) বিষয়ক অ্যাডভোকেসি
৬. মুসলিম ঐক্য ও কৌশলগত সচেতনতা বৃদ্ধি

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা

ঢাকা সফরের অংশ হিসেবে মোহাম্মদ জাকির হোসেন বেশ কয়েকটি একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সেমিনারের আয়োজন করেন। এতে বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন ও তুরস্কের প্রখ্যাত স্কলার, সাংবাদিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজ চিন্তাবিদগণ অংশ নেন। বিশ্লেষকদের মতে, চলমান ভূ-রাজনৈতিক ও মানবিক সংকটের মুখে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সচেতন সংলাপ, বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা এবং নৈতিক সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলো অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

বিক্ষিপ্ত সংঘাত, মেরুকরণ এবং তথ্য-যুদ্ধের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে—গবেষণা, নৈতিক গণমাধ্যম চর্চা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত এই উদ্যোগগুলো মুসলিম বিশ্বে ইতিবাচক সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

ড. আফম খালিদ হোসেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ সফরের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেনের সাথে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জাকির হোসেনের সৌজন্য সাক্ষাৎ।

সাক্ষাতকালে তিনি ড. খালিদ হোসেনের হাতে বিশ্বজুড়ে বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য সদ্য প্রকাশিত গবেষণা ও চিন্তামূলক সাময়িকী 'আল-উম্মাহ জার্নাল'-এর প্রথম বাংলা সংস্করণের একটি কপি তুলে দেন।

জার্নালটির প্রথম সংখ্যার অন্যতম লেখক ড. খালিদ হোসেন এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আধুনিক যুগে দায়িত্বশীল ইসলামি সাংবাদিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং আল-উম্মাহ জার্নালের প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন, বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্টা মাননীয় ড. এ.এফ.এম. খালিদ হোসেনের কাছে জার্নালটির প্রথম সংখ্যাটি হস্তান্তর করছেন।

কর্মকাণ্ডের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এ সময় জার্নালের সম্পাদকীয় ভিশন, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য এবং এর ডিজিটাল ও আন্তর্জাতিক প্রচার প্রসারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা

তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার পর অংশগ্রহণকারীরা সনদপত্র গ্রহণ করে একটি দলবদ্ধ ছবিতে পোজ দেন।

■ আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং আল-উম্মাহ জার্নালের প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন, ফিলিস্তিনের ইতিহাস, রাজনীতি ও সমসাময়িক বিষয়াবলী অন্বেষণের জন্য বাংলাদেশ ইসলামী চিন্তা ইনস্টিটিউট (বিআইআইটি) এবং আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক যৌথ ভাবে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে "ফিলিস্তিনের ইতিহাস ও সমস্যাবলী" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিলিস্তিনি আলেম ও ইস্তাম্বুলের আল-রাওয়াদ একাডেমির পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আদনান আলহাজ শাকের।

হয়। উভয় পক্ষই সমসাময়িক মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করা অপপ্রচার, আদর্শিক বিভাজন ও সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি দূর করতে একটি নির্ভরযোগ্য ও নীতিবান মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

ঢাকায় ফিলিস্তিন বিষয়ক ১৭ ঘণ্টার লেকচার সিরিজ

ফাউন্ডেশনের শিক্ষামূলক ও মানবিক মিশনের অংশ হিসেবে–বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (BIIT), ইস্তাম্বুলের আল-রুওয়াদ একাডেমি ফর জেরুজালেম স্টাডিজ এবং বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের যৌথ উদ্যোগে "ফিলিস্তিনের ইতিহাস ও সমসাময়িক সংকট" শীর্ষক একটি বিশেষ লেকচার সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকার উত্তরার বিআইআইটি (BIIT) ট্রেনিং রুমে ২০ থেকে ২২ মে ২০২৬ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী এই শিক্ষামূলক কোর্সটি পরিচালিত হয়। সেশনগুলো পরিচালনা করেন ফিলিস্তিনি স্কলার এবং আল-রুওয়াদ একাডেমির পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আদনান আলহাজশাকের।

এই লেকচার সিরিজে ফিলিস্তিন সংকটের বহুমাত্রিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়, যার মধ্যে ছিল:

- ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমের ঐতিহাসিক বিবর্তন।
- সংকটের রাজনৈতিক ও আইনি প্রেক্ষাপট।
- ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ও মানবিক চ্যালেঞ্জ।
- আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমীকরণ।
- পশ্চিমা মিডিয়ার বয়ান (Media Narratives) ও বৈশ্বিক ক্ষমতার কাঠামো।
- ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুসলিম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে এই আয়োজনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সেমিনার: সভ্যতার সংকট ও ফিলিস্তিন প্রশ্ন

গত ২২ মে ২০২৬ তারিখে উত্তরার বিআইআইটি সেমিনার হলে "ফিলিস্তিন এবং আধুনিক সভ্যতার সংকট" শীর্ষক আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ মীর লুৎফুল কবীর সাী। তিনি ফিলিস্তিন ইস্যুটিকে কেবল আঞ্চলিক রাজনৈতিক বিবাদ হিসেবে নয়, বরং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নৈতিক ও সভ্যতার সংকট হিসেবে তুলে ধরেন।

তিনি তাঁর বক্তব্যে 'বৈশ্বিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার', 'মিডিয়া উপস্থাপনা ও রাজনৈতিক বয়ান', 'আন্তর্জাতিক মানবিক দায়িত্ব', নৈতিক সাংবাদিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ' এবং 'বৈশ্বিক রাজনীতিতে নৈতিকতার অবক্ষয়' বিষয়গুলো বিশদভাবে আলোচনা করেন। আল-

■ বিআইআইটি-এর মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, ফিলিস্তিন বিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে তাঁর সমাপনী বক্তব্য প্রদান করছেন।

উম্মাহ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিন ও গাজা নিয়ে শিক্ষামূলক অ্যাডভোকেসি ও মানবিক সচেতনতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

মুসলিম ঐক্য ও কৌশলগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা

ঢাকায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও চিন্তাবিদ সাব্বির উদ্দিন আহমেদের বাসভবনে এক বিশেষ কৌশলগত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জাকির হোসেন এবং ফিলিস্তিনি স্কলার ইঞ্জিনিয়ার আদনান আলহাজশাকের এতে অংশ নেন। সভায় ফিলিস্তিন ও গাজায় চলমান মানবিক বিপর্যয়সহ মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল:

- ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ ও বাস্তুচ্যুতি।
- মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ভূ-রাজনীতি এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতায় পশ্চিমা শক্তির প্রভাব।
- উম্মাহর কৌশলগত সহযোগিতা ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা।
- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক মেলবন্ধন।

সভায় সুন্নি-শিয়া মেরুকরণসহ সব ধরণের উপদলীয় বিভেদ ভুলে মুসলিম বিশ্বে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হয়। আলোচকেরা উল্লেখ করেন যে–তুরস্ক, পাকিস্তান এবং সৌদি আরবের মতো দেশগুলোর প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, গবেষণা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার মতো কৌশলগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা রয়েছে, যা মুসলিম সমাজের সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

অনুষ্ঠান শেষে জাকির হোসেন ফিলিস্তিনি অতিথি ইঞ্জিনিয়ার আদনান আলহাজশাকেরের হাতে 'আল-উম্মাহ' জার্নাল তুলে দেন। অন্যদিকে, সাব্বির উদ্দিন আহমেদ তাঁর নিজের লেখা ফিলিস্তিন প্রতিরোধ সাহিত্য, তুর্কি রাজনীতি এবং প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের অবদান বিষয়ক বেশ কয়েকটি বই অতিথিদের উপহার দেন।

জেরুজালেম স্টাডিজ বিষয়ক বিশেষ একাডেমিক কোর্স

ইস্তাম্বুলের আল-রুওয়াদ একাডেমির সহযোগিতায় ঢাকার তানজীম আল-উম্মাহ স্কুলে ১৩ থেকে ১৫ মে ২০২৬ পর্যন্ত 'জেরুজালেম স্টাডিজ' বিষয়ক একটি বিশেষ একাডেমিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

আদনান আলহাজশাকের এবং জাকির হোসেনের যৌথ পরিচালনায় এই কোর্সে জেরুজালেমের ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, ভূ-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। আয়োজকদের মতে, এই উদ্যোগটি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশ ও তুরস্কের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একাডেমিক সহযোগিতা বাড়াতে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। ■

কুরবানি বিতরণ কর্মসূচি

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন মানবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশজুড়ে স্বল্প আয় ও অভাবী পরিবারের মাঝে কুরবানির গোশত বিতরণ করে। এই কার্যক্রমের স্মরণীয় কিছু মুহূর্ত– যা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি, আশা এবং সমর্থন এনে দেয়।

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের কষ্ট লাঘব করে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট লাঘব করবেন।"

সংকটাপন্ন বিশ্ব:
ফিলিস্তিন, বহুমাত্রিক সংকট এবং নৈতিক ব্যবস্থার পতন

এম. নাসির জাওয়েদ
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক; 'ইয়ারবুক অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড'-এর সাবেক সম্পাদক, নয়া দিল্লি

ফিলিস্তিনে আমরা এক প্রত্যক্ষ গণহত্যার দৃশ্য দেখেছি, যা ২১শ শতাব্দীর অন্যতম নথিভুক্ত ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই সহিংসতা শুধু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ করেনি, বরং বিশ্বনেতাদের নৈতিক অবস্থান নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে এবং বৈশ্বিক বিবেককে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এতে মানবজাতি আবারও সেই মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে—বিশ্ব আসলে কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, যার উত্তর আমরা বহু প্রজন্ম ধরে খুঁজে পাইনি।

ফিলিস্তিনে যা এখনও ঘটছে, তা কোনো বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। বরং এটি সেই নির্মম বাস্তবতার নগ্ন উন্মোচন, যার মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতোমধ্যেই অতিক্রম করছে। এটি

গাজায় চলমান গণহত্যা এমন এক কুৎসিত বিশ্বের প্রতিচ্ছবি, যা সাধারণ মানুষের বিবেক ও মানবিক অনুভূতিকে আঘাত করে।

সভ্যতার পাতলা আবরণ ছিঁড়ে ফেলে আমাদের সামনে একের পর এক সংকটের নির্মম চিত্র তুলে ধরেছে—অবিরাম যুদ্ধ, সহিংস ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন, দ্রুততর জলবায়ু বিপর্যয়, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, শাসনব্যবস্থার ভাঙন, জোরপূর্বক অভিবাসন এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রযুক্তিগত অস্থিরতা। এসব একে অপরকে পুষ্ট করে বিশ্বকে ঠেলে দিচ্ছে ক্রমশ গভীরতর এক স্থায়ী বৈশ্বিক সংকটের দিকে।

আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটির সভাপতি ডেভিড মিলিব্যান্ড যেমন সতর্ক করে বলেছেন, আমরা এখন প্রবেশ করেছি "এক নতুন বৈশ্বিক বিশৃঙ্খলার যুগে"—এমন এক বাস্তবতায়, যা আজকের নেতাদের ভয়াবহ অক্ষমতাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে; তারা নিজেদের জনগণকেই কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ, মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা।

এর একটি উদাহরণই সবকিছু স্পষ্ট করে দেয়: বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অন্তত ২৪ কোটি মানুষ মানবিক সহায়তার প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে, কারণ চলমান মানবিক সংকট তাদের জীবনকে গভীরভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

তবে আগে গাজার কথাই বলা যাক। গাজা যেন ক্রমেই এক অন্ধকার, নীরব অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে—এক এমন নীরবতা, যা বিশ্বব্যাপী নিষ্ঠুরতার প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করে। এটি আমাদের সামনে সেই কঠিন সত্য তুলে ধরে যে, সমসাময়িক ভূরাজনীতিতে মানবিক দুর্ভোগ ক্রমশ কতটা তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

গাজা/ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিনে যা ঘটছে, তা এক বৈশ্বিক ব্যবস্থাগত বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবিত হওয়া বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী উদাহরণ। এখানে সংঘটিত ট্র্যাজেডি সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অচলাবস্থা ও নৈতিক বিভাজনের সবচেয়ে দৃশ্যমান অভিযোগপত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

এটা শুধু এটাই নয় যে বিশ্ব যুদ্ধ থামাতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি আরও গভীর এক সভ্যতাগত রোগের উন্মোচন—সর্বজনীন নীতির জায়গায় বেছে বেছে নৈতিকতা প্রয়োগ, ভূরাজনৈতিক সুবিধাবাদ এবং লেনদেনভিত্তিক ক্ষমতার রাজনীতির প্রাধান্য। গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ দেখিয়ে দিয়েছে যে ১৯৪৫ সালের পর গড়ে ওঠা উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, যা মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন এবং সমষ্টিগত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, মানবতার বড় অংশের চোখে তার বৈধতা হারাচ্ছে।

চলমান সভ্যতাগত অকার্যকারিতা পশ্চিমা পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা স্পষ্ট দ্বৈত মানদণ্ডের ধারণাকে আরও তীক্ষ্ণ করেছে। এই অসুস্থতার গভীরতা আরও বেশি: জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কার্যত ক্ষমতাহীন, ইউরোপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখ ফিরিয়ে রাখছে, আর যারা সমাধান চাইছে বলে দাবি করে তারাও এক ধরনের নির্লজ্জ ও অস্বস্তিকর নীরবতা বজায় রেখেছে।

চলমান এই সভ্যতাগত অকার্যকারিতা পশ্চিমা পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা স্পষ্ট দ্বৈত মানদণ্ডের ধারণাকে আরও তীব্র করেছে। এই সংকট আরও গভীরে বিস্তৃত: জাতিসংঘ এখনো কার্যত ক্ষমতাহীন অবস্থায় রয়েছে, ইউরোপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখ ফিরিয়ে রাখছে, আর যারা সমাধান চায় বলে দাবি করে তারাও এক ধরনের নির্লজ্জ ও অস্বস্তিকর নীরবতা বজায় রেখেছে। বিশ্ব বাস্তবেই এক বিপজ্জনক বিশৃঙ্খলার যুগে প্রবেশ করছে।

যা একসময় বিচ্ছিন্ন ভূরাজনৈতিক সংকট হিসেবে শুরু হয়েছিল, তা এখন এক অনেক বড় বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে: অস্থিতিশীলতা, বিভাজন এবং নৈতিক ক্লান্তিতে জর্জরিত এক বৈশ্বিক পরিস্থিতি। গাজার ধ্বংসযজ্ঞ, ইরানকে ঘিরে বিস্তৃত সংঘাত এবং ইউক্রেনের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ–এসবের মাধ্যমে মানবজাতি এখন শুধু আঞ্চলিক সংঘাতই নয়, বরং ১৯৪৫ সালের পর গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ার দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করছে।

বাছাইকৃত নৈতিকতা

পুরোনো ধারণাগুলো আর কার্যকর নেই। আন্তর্জাতিক আইন এখন বেছে বেছে প্রয়োগ করা হয় বলে মনে হচ্ছে। বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো অচলাবস্থায় রয়েছে। কূটনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। নৈতিক ভাষা এখন লেনদেনভিত্তিক হয়ে উঠেছে। নীতির ওপর ক্রমেই ক্ষমতার প্রাধান্য বাড়ছে।

পণ্ডিত ও গবেষকেরা এখন এই ঐতিহাসিক সময়কে 'বহুসংকটের যুগ' হিসেবে বর্ণনা করেন–অর্থাৎ এমন এক সময়, যখন একাধিক সংকট একই সঙ্গে উপস্থিত হয়ে পরস্পরকে আরও গভীর ও তীব্র করে তোলে। এর মধ্যে রয়েছে যুদ্ধ, জলবায়ু বিপর্যয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য, গণতান্ত্রিক অবক্ষয়, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, প্রযুক্তিগত অস্থিরতা, খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান।

সাধারণ অস্থিতিশীলতার তুলনায় বহুসংকটের বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে কোনো সংকটই আলাদা বা বিচ্ছিন্ন থাকে না; বরং প্রতিটি সংকট অন্য সংকটকে প্রভাবিত ও তীব্রতর করে। এর ফলে সংকটগুলো একে অপরকে পুষ্ট করে এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি সামগ্রিক ভঙ্গুরতা ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ফিলিস্তিনের বিপর্যয় এখন এই বৈশ্বিক বিশৃঙ্খলার সবচেয়ে প্রতীকী চিত্র হয়ে উঠেছে।

গাজা আর শুধু একটি ভূখণ্ডগত সংঘাত নয়; এটি পুরো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য এক নৈতিক আত্মসমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া জনপদ, অনাহারে থাকা বেসামরিক মানুষ, ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি, বিধ্বস্ত হাসপাতাল এবং আতঙ্কগ্রস্ত শিশুদের ছবি বিশ্ববিবেককে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে, যা সাম্প্রতিক দশকগুলোর খুব কম ঘটনাই দিতে পেরেছে।

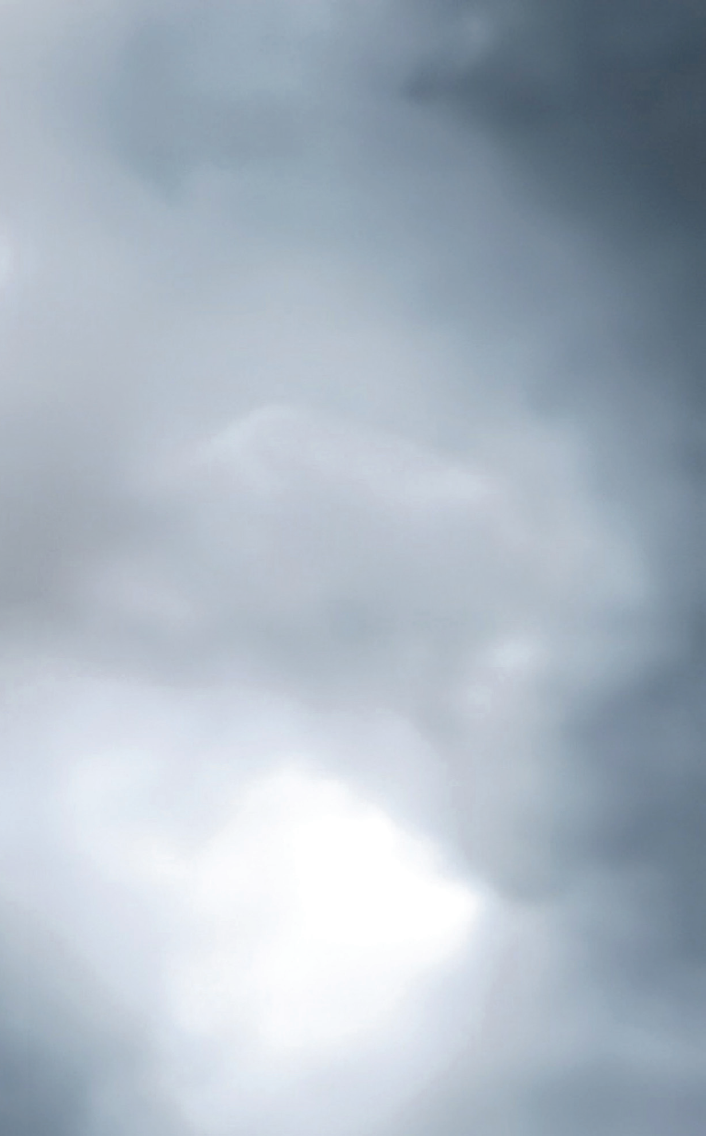

ধ্বংসযজ্ঞকে আইনগতভাবে গণহত্যা বলা হোক বা না হোক, এর ভয়াবহতার মাত্রা সমকালীন বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে মৌলিকভাবে বদলে দিয়েছে। গ্লোবাল সাউথের কোটি মানুষের কাছে গাজা এখন উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার পতনের প্রতীক—যে ব্যবস্থা সর্বজনীন মানবাধিকার, সমষ্টিগত নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক আইনের সমান প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বের বড় একটি অংশ এখন সেখানে দেখছে বেছে বেছে প্রয়োগ করা নৈতিকতা।

এই দ্বৈততা এখন আর উপেক্ষা করার সুযোগ নেই: কিছু সংঘাতে আন্তর্জাতিক আইন জোরালোভাবে প্রয়োগ করা হলেও অন্য কিছু ক্ষেত্রে তা যেন স্থগিত রাখা হয়। এই অসামঞ্জস্য শুধু পশ্চিমা পররাষ্ট্রনীতির প্রতিই নয়, বরং যুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি হিসেবে গড়ে ওঠা পুরো নীতিগত কাঠামোর প্রতিও মানুষের আস্থা ক্ষয় করে দিচ্ছে।

বিশ্বাসযোগ্যতা যখন ভেঙে পড়ে

ইসরাইলের প্রতি ওয়াশিংটনের অবিচল কূটনৈতিক ও সামরিক সমর্থন এই ধারণাকে আরও তীব্র করেছে। দীর্ঘদিন

ইরানকে ঘিরে বিস্তৃত হয়ে ওঠা সংঘাত ইতোমধ্যেই অস্থির একটি অঞ্চলে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির আশঙ্কা তৈরি করছে। আজকের মধ্যপ্রাচ্য যেন এক ভূরাজনৈতিক বারুদের স্তূপ, যেখানে সামান্য ভুল হিসাবও বহু আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিকে জড়িয়ে ভয়াবহ সংঘাতের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে

ধরে নিজেকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করা যুক্তরাষ্ট্র এখন ক্রমবর্ধমান সমালোচনার মুখে পড়েছে, কারণ তারা এমন নীতিকে নিয়ন্ত্রণে অনিচ্ছুক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, যেগুলোকে মানবিক সংস্থা, অধিকার সংগঠন এবং বৈশ্বিক জনমতের বৃহৎ অংশ ব্যাপকভাবে নিন্দা করেছে। এর পরিণতি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত।

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকাজুড়ে পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি হতাশা দ্রুত বাড়ছে। অনেকে ক্রমেই বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে নিয়মভিত্তিক কাঠামো হিসেবে নয়, বরং বেছে বেছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এক ধরনের শ্রেণিবিন্যাস হিসেবে দেখছে—যেখানে ক্ষমতাই বৈধতা নির্ধারণ করে এবং জোট নির্ধারণ করে নৈতিকতা। এই ধারণা ভূরাজনৈতিকভাবে গভীর পরিবর্তন ডেকে আনছে।

এটি সংশোধনবাদী শক্তিগুলোকে আরও শক্তিশালী করছে, বৈশ্বিক মেরুকরণ বাড়াচ্ছে, কূটনৈতিক ঐকমত্য দুর্বল করছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ভূরাজনৈতিক জোটগুলোর উত্থানকে ত্বরান্বিত করছে। বিশ্ব ক্রমেই বিভক্ত হয়ে পড়ছে ক্ষোভ, অসন্তোষ এবং কৌশলগত অবিশ্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলয়ে।

একই সময়ে, ইরানকে ঘিরে বিস্তৃত হয়ে ওঠা সংঘাত ইতোমধ্যেই অস্থির একটি অঞ্চলে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির আশঙ্কা তৈরি করছে। আজকের মধ্যপ্রাচ্য যেন এক ভূরাজনৈতিক বারুদের স্তূপ, যেখানে সামান্য ভুল হিসাবও বহু আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিকে জড়িয়ে ভয়াবহ সংঘাতের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। বিপদ শুধু যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং স্থায়ী অস্থিতিশীলতাকে স্বাভাবিক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রবণতার মধ্যেও নিহিত।

স্থায়ী সংকট

একইভাবে, ইউক্রেনের যুদ্ধ আবারও শীতল যুদ্ধধাঁচের

অতি-ডানপন্থী রাজনীতি সাধারণত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতা, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন এবং সামাজিক বিভাজনের সময়কালে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এটি নিশ্চিততা, শক্তি এবং জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই ভয়, অসহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক অবক্ষয়কে আরও গভীর করে তোলে

বৈরিতাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং বৈশ্বিক রাজনীতিকে পুনরায় সামরিকীকরণ করেছে। ইউরোপ কয়েক দশকে দেখা যায়নি এমন গতিতে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে সামরিক বাজেট দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করছে। কূটনীতির ভাষাকে প্রতিস্থাপন করেছে প্রতিরোধনীতির ভাষা। মানবজাতি ধীরে ধীরে এমন এক বিশ্বে প্রবেশ করছে, যা সহযোগিতার চেয়ে নিরাপত্তাকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার দ্বারা বেশি পরিচালিত।

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, এসব সংকট বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে না। এগুলো আরও তীব্রতর জলবায়ু জরুরি অবস্থা, ক্রমবর্ধমান স্বৈরতন্ত্র, শরণার্থী বাস্তুচ্যুতি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পানির সংকট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রভাব বিস্তারের কারণে সৃষ্ট প্রযুক্তিগত অস্থিরতার সঙ্গে একে অপরের ওপর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফল হচ্ছে, যাকে এখন অনেক বিশ্লেষক "বহুসংকটের যুগ" বলে আখ্যায়িত করছেন—যা এক এমন অবস্থা, যেখানে সমাজগুলো আর সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের দিকে অগ্রসর হয় না; বরং এক অস্থিতিশীলতা থেকে সরাসরি আরেক অস্থিতিশীলতার মধ্যে প্রবেশ করে।

ব্রিটেনের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড মিলিব্যান্ড একে বর্ণনা করেছেন "একটি নতুন বিশ্ব বিশৃঙ্খলা" হিসেবে—এক এমন যুগ, যা রাষ্ট্রগুলোর জন্য নিয়ম এবং ব্যক্তিদের জন্য অধিকারের ভিত্তিতে নয়, বরং ক্রমশ উভয়ের অনুপস্থিতির মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রায় ২৪ কোটি মানুষের মানবিক সহায়তা প্রয়োজন। যুদ্ধ, নিপীড়ন, অর্থনৈতিক পতন এবং পরিবেশগত দুর্যোগের কারণে কোটি কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রয়েছে। সম্পূর্ণ সমাজগুলো ক্লান্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছে।

তবু এসব সংকটের নিচে আরও গভীর একটি সমস্যা লুকিয়ে রয়েছে: রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতা। সমকালীন বিশ্ব কেবল সংঘাতেই ভুগছে না, বরং রাষ্ট্রনায়কসুলভ নেতৃত্বের এক বিপজ্জনক ঘাটতিতেও আক্রান্ত।

আজকের অনেক নেতা যেন জনতুষ্টিবাদ, আদর্শিক চরমপন্থা, অতিরাষ্ট্রবাদ এবং প্রদর্শনমূলক রাজনীতির এক অন্তহীন চক্রে আটকে পড়েছেন। শাসনব্যবস্থা ক্রমেই দীর্ঘমেয়াদি দূরদর্শিতার চেয়ে আবেগনির্ভর মেরুকরণকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজনৈতিক বক্তব্য প্রজ্ঞার চেয়ে বিভাজনকেই বেশি পুরস্কৃত করছে। নেতারা অনেক সময় মানবতার উদ্দেশে নয়, বরং নিজেদের নির্বাচনী গোষ্ঠীর উদ্দেশেই কথা বলেন।

অতি-ডানপন্থী রাজনীতি

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, ডোনাল্ড ট্রাম্প, নরেন্দ্র মোদি এবং ইউরোপজুড়ে বিভিন্ন অতি-ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী নেতা বৃহত্তর বৈশ্বিক পরিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ—যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী জাতীয়তাবাদ, পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি এবং আদর্শিক মেরুকরণ ক্রমশ প্রাধান্য পাচ্ছে।

এই প্রবণতা কোনো একটি দেশ বা সভ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি বৈশ্বিক বাস্তবতা।

অতি-ডানপন্থী রাজনীতি সাধারণত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতা, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন এবং সামাজিক বিভাজনের সময়কালে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এটি নিশ্চিততা, শক্তি এবং জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই ভয়, অসহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক অবক্ষয়কে আরও গভীর করে তোলে।

সংখ্যালঘুরা হয়ে ওঠে বলির পাঁঠা। অভিবাসীরা হয়ে ওঠে হুমকি। ভিন্নমত হয়ে ওঠে বিশ্বাসঘাতকতা।

ডিজিটাল পরিবেশের উত্থান এই অবক্ষয়কে আরও দ্রুততর করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো ক্রোধ, বিভ্রান্তিকর তথ্য, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং আদর্শিক গোষ্ঠীগত বিভাজনকে আরও শক্তিশালীভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। জনপরিসরের আলোচনায় বিষয়বস্তুর চেয়ে নাটকীয়তা বেশি পুরস্কৃত হচ্ছে। সত্য নিজেই এখন এক বিতর্কিত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক সমাজে সহানুভূতি কমে যাচ্ছে, আর ক্রোধ হয়ে উঠছে রাজনৈতিক মুদ্রা।

একই সময়ে মানবজাতি এক বৈশ্বিক পরিবেশগত জরুরি অবস্থার মুখোমুখি। জলবায়ু পরিবর্তন আর ভবিষ্যতের হুমকি নয়; এটি এখনকার বাস্তব বিপর্যয়। তাপপ্রবাহ, খরা, বন্যা, দাবানল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বিভিন্ন মহাদেশে সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করছে। পানির সংকট আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার বহু অঞ্চলের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। খাদ্যব্যবস্থা ক্রমশ সংঘাত ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

তবুও বিজ্ঞানীরা যখন অপরিবর্তনীয় পরিবেশগত ক্ষতির সতর্কবার্তা দিচ্ছেন, তখন বৈশ্বিক জলবায়ু পদক্ষেপ রয়ে যাচ্ছে খণ্ডিত, অপর্যাপ্ত এবং স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের অধীন।

নৈতিক দ্বন্দ্বটি অত্যন্ত ভয়াবহ: মানবজাতি অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করলেও এখনো সমষ্টিগত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের সংগঠিত করতে অক্ষম।

অর্থনৈতিক অবক্ষয়

অর্থনৈতিক বৈষম্য এই সংকটকে আরও গভীর করে তুলছে। সম্পদের ক্ষুদ্র এক কেন্দ্রীভবনের পাশাপাশি এখন ব্যাপক অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সীমিত শিক্ষার সুযোগের মধ্যে সংগ্রাম করছে, আর অভিজাতরা অসাধারণ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা সঞ্চয় করছে।

এই ভারসাম্যহীনতা সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করে এবং জনকল্যাণের পরিবর্তে অলিগার্কিক স্বার্থে কাজ করছে বলে বিবেচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ক্ষোভ বাড়িয়ে তোলে।

শরণার্থী সংকট সম্ভবত বৈশ্বিক সহমর্মিতার সবচেয়ে স্পষ্ট ব্যর্থতা তুলে ধরে।

যুদ্ধ ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে পালিয়ে যাওয়া লাখো মানুষ ক্রমশ আশ্রয় ও সুরক্ষার পরিবর্তে সীমান্তের দেয়াল, আর সংহতির বদলে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মুখোমুখি হচ্ছে। ধনী রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই মানবাধিকারের কথা উচ্চকণ্ঠে বললেও বাস্তবে দায়িত্বের ন্যায্য বণ্টন ও ভাগাভাগি থেকে সরে থাকে। যখন কোনো সভ্যতা বাস্তুচ্যুত মানুষকে মানবজাতির সমান সদস্য হিসেবে না দেখে প্রধানত বোঝা হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে, তখন সেই সভ্যতা তার নৈতিক দিকনির্দেশনা হারাতে শুরু করে।

তাই আজকের বিশ্বের সামনে থাকা গভীরতর বিপদটি সভ্যতাগত। মানবজাতি এমন এক যুগে প্রবেশ করছে যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো সংকটের তুলনায় দুর্বল মনে হয়, রাজনীতি সমস্যার তুলনায় ছোট হয়ে পড়ে, এবং নেতৃত্ব ক্রমশ নৈতিক কল্পনাশক্তি প্রয়োগে অক্ষম হয়ে ওঠে। জাতিসংঘ নিজেই, তার বিশাল মানবিক অবদান সত্ত্বেও, উচ্চ আদর্শ এবং ভূরাজনৈতিক ভেটোর মধ্যে আটকে আছে বলে মনে হয়। যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়েছিল, সেগুলো এখন প্রায়ই বিপর্যয় ঘটার পর কেবল তা ব্যবস্থাপনা করে।

এই অচলাবস্থা বিশ্বকে এক ভয়াবহ বার্তা দেয়: কৌশলগত স্বার্থ যখন নৈতিক দায়িত্বকে ছাপিয়ে যায়, তখন বেসামরিক মানুষের দুর্ভোগকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। ফিলিস্তিন এই সংকটকে সাম্প্রতিক স্মৃতির যেকোনো ঘটনার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে উন্মোচন করেছে। এটি সেই আয়না, যেখানে বিশ্ব নিজের দ্বন্দ্বগুলোকে দেখে।

তবুও ইতিহাস আমাদের এটিও শেখায় যে গভীর বিশৃঙ্খলার সময়গুলো প্রায়ই বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক নবজাগরণ সৃষ্টি করতে পারে। পতনের মুহূর্ত কখনো কখনো সভ্যতাকে তাদের ধারণাগুলো পুনর্বিবেচনা করতে এবং নৈতিক ভিত্তি পুনর্গঠন করতে বাধ্য করে। বর্তমান যুগে এমন একটি পুনর্সামঞ্জস্য অত্যন্ত জরুরি।

বিশ্বের কেবল যুদ্ধবিরতি, মানবিক সহায়তা বা সাময়িক কূটনৈতিক সমঝোতার প্রয়োজন নেই–যদিও সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রয়োজন একটি নতুন বৈশ্বিক নৈতিকতা, যা সমান মানবমর্যাদা, নীতিনিষ্ঠ কূটনীতি, বহুপাক্ষিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের ধারাবাহিক প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।

বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল, বিশ্বাসযোগ্য এবং কার্যকর করতে গুরুতর সংস্কারের প্রয়োজন। কূটনীতিকে সামরিকবাদের ওপর তার প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করতে হবে। জলবায়ু কার্যক্রমকে প্রান্তিক নীতিগত বিতর্ক নয়, বরং সভ্যতার অগ্রাধিকার হতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই নতুন করে কল্পনা করতে হবে।

শেষ কথা

একবিংশ শতাব্দী এমন নেতৃত্বের মডেলের অধীনে অনির্দিষ্টকাল টিকে থাকতে পারে না, যা নাটকীয়তা, প্রতিশোধ, অতিরাষ্ট্রবাদ এবং স্থায়ী সংঘাত দ্বারা পরিচালিত। মানবজাতির প্রয়োজন এমন নেতাদের, যারা কেবল নির্বাচন জেতা বা যুদ্ধ জেতার সক্ষমতা রাখেন না, বরং সভ্যতাকেই টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখেন। এই বিষয়টির গুরুত্ব অস্তিত্বগত।

একটি পথ আরও গভীর বিভাজন, পরিবেশগত ধ্বংস, স্থায়ী যুদ্ধ, প্রযুক্তিনির্ভর স্বৈরতন্ত্র এবং স্বাভাবিকীকৃত মানবিক বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়।

অন্য পথটি সহযোগিতা, ন্যায়বিচার, টেকসই উন্নয়ন এবং অভিন্ন মানব নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। এই নির্বাচন কেবল রাজনৈতিক নয়; এটি সভ্যতাগত।

যদি গাজাকে কেবল আরেকটি সংঘাত হিসেবে মনে রাখা হয়, তবে বিশ্ব কিছুই শিখবে না। কিন্তু যদি এটি মানবজাতিকে বেছে বেছে নৈতিকতার দেউলিয়াত্ব, নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতার রাজনীতির বিপদ এবং বৈশ্বিক নৈতিকতা পুনর্গঠনের জরুরি প্রয়োজনের মুখোমুখি করাতে পারে, তবে হয়তো এই ট্র্যাজেডি থেকেও কিছু অর্থবহ শিক্ষা বেরিয়ে আসতে পারে।

অন্যথায় ভবিষ্যৎ ইতিহাসবিদরা এই যুগকে এমন এক সময় হিসেবে দেখবেন, যখন মানবজাতির কাছে বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সব সম্পদ ছিল–তবু তা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা, সাহস এবং নৈতিক নেতৃত্বের অভাব ছিল। ■

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে
কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে আর্থিক খাতের দক্ষ জনশক্তি

অধ্যাপক এম. আব্দুল আজিজ, পিএইচডি
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, বিআইআইএফ (ইওওঋ)
ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি), ওআইসি
ই-মেইল: azizbiit@gmail.com

বাংলাদেশ বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাংকিং, বীমা, ফিনটেক, ই-কমার্স এবং করপোরেট খাতের দ্রুত সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে দেশটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এই রূপান্তরের পথেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটি গুরুতর দুর্বলতা–আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও জটিল আর্থিক পরিবেশে সফলভাবে কাজ করার উপযোগী বহুমুখী দক্ষতাসম্পন্ন আর্থিক পেশাজীবীর তীব্র সংকট।

প্রচলিত প্রশিক্ষণব্যবস্থাগুলো এখন আর চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে না; এগুলো এমন স্নাতক তৈরি করছে, যারা তাত্ত্বিক জ্ঞানে শক্তিশালী হলেও ব্যবহারিক ও বহুমাত্রিক দক্ষতার ক্ষেত্রে দুর্বল। এর ফল কী? নিয়োগদাতাদের এই ঘাটতি পূরণে অতিরিক্ত ১ থেকে ২ বছর ব্যয় করতে হচ্ছে, আর একই সঙ্গে দেশের উচ্চাভিলাষী প্রবৃদ্ধির যাত্রা বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি হচ্ছে।

এর সমাধান নিহিত রয়েছে সমন্বিত আর্থিক পেশাজীবী গড়ে তোলার মধ্যে—এমন বিশেষজ্ঞ, যারা গভীর আর্থিক দক্ষতার সঙ্গে ডিজিটাল সক্ষমতা, নিয়ন্ত্রক কাঠামো সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান, উৎকৃষ্ট যোগাযোগদক্ষতা এবং কৌশলগত দূরদর্শিতার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম। তারাই টেকসই ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম অগ্রগতির চালিকাশক্তি হতে পারেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে আর্থিক খাতের পেশাজীবী তৈরির প্রধান মাধ্যম হলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং বিশেষায়িত পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ। তবে এই দুটি পথই এমন স্নাতক তৈরি করতে যথেষ্ট নয়, যারা কর্মক্ষেত্রের ব্যবহারিক ও বহুমাত্রিক চাহিদার সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে খাপ খাওয়াতে সক্ষম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা অনেক শিক্ষার্থীর তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকলেও আর্থিক বিশ্লেষণ, ডিজিটাল টুলসের ব্যবহার, নিয়ন্ত্রক বিধিবিধান অনুসরণ, বাস্তব সমস্যার সমাধান এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাদের হাতে-কলমে দক্ষতার ঘাটতি থাকে।

অনেক শিক্ষার্থী তাদের ডিগ্রি সম্পন্ন করেও জটিল আর্থিক মডেল, ইআরপি (উজচ) সফটওয়্যার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর বিশ্লেষণী টুলস কিংবা মৌলিক করপোরেট প্রতিবেদন প্রণয়নের কাঠামো নিয়ে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না। ফলে নিয়োগদাতাদের প্রায়ই স্নাতকদের পূর্ণাঙ্গভাবে কর্মদক্ষ করে তুলতে অতিরিক্ত এক থেকে দুই বছর সময় ও মূল্যবান সম্পদ ব্যয় করতে হয়।

চ্যালেঞ্জগুলো শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পেশাগত সনদগুলো বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত ও সম্মানজনক হলেও, সেগুলো প্রায়ই নির্দিষ্ট ও সীমিত কিছু ক্ষেত্রের ওপর কেন্দ্রীভূত থাকে। হিসাববিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচিগুলো মূলত নিরীক্ষা ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়, বিনিয়োগসংক্রান্ত সনদগুলো পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়, আর তথ্যপ্রযুক্তি-নিরীক্ষা কর্মসূচিগুলো প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

কিন্তু বাংলাদেশের কর্মপরিবেশে—বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) এবং দ্রুত সম্প্রসারণশীল করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে—নিয়োগদাতারা একজন আর্থিক পেশাজীবীর কাছ থেকে কর ব্যবস্থাপনা থেকে ট্রেজারি কার্যক্রম, বিধিবিধান প্রতিপালন থেকে বাজেট প্রণয়ন, ডিজিটাল রিপোর্টিং থেকে কৌশলগত পরিকল্পনা পর্যন্ত নানামুখী দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা প্রত্যাশা করেন।

কর্মবাজারের চাহিদা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণব্যবস্থা থেকে তৈরি হওয়া জনবলের দক্ষতার মধ্যে এই অসামঞ্জস্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে আরও তীব্র করে তুলছে।

এই সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হলো বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পখাত এবং পেশাগত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অর্থবহ সহযোগিতার অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায়ই শিল্পখাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করে, আর নিয়োগদাতারা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে একাডেমিক কর্মসূচিগুলো বাস্তব কর্মপরিবেশের চাহিদা ও বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না।

অন্যদিকে, পেশাগত প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষার পথ তৈরি করার পরিবর্তে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হয়। এই বিচ্ছিন্নতা এমন একটি ত্রিমুখী ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, যেখানে প্রতিটি পক্ষই মনে করে দক্ষতা উন্নয়নের দায়িত্ব অন্য কারও।

এদিকে শিক্ষার্থীরাই হয়ে ওঠে এই খণ্ডিত ব্যবস্থার ভুক্তভোগী, যা তাদের পেশাজীবনের বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়।

এমন পরিস্থিতিতে সমন্বিত আর্থিক পেশাজীবী (ইন্টিগ্রেটেড ফাইন্যান্স প্রফেশনাল) ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ধরনের পেশাজীবী কোনো একক বিশেষায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না; বরং তিনি আর্থিক জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, নিয়ন্ত্রক কাঠামো সম্পর্কে বোঝাপড়া, যোগাযোগদক্ষতা এবং কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টির সমন্বিত রূপ ধারণ করেন।

একজন সমন্বিত আর্থিক পেশাজীবীর উন্নত হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, আর্থিক পরিকল্পনা, কর ও ভ্যাট ব্যবস্থাপনা, বাজেট প্রণয়ন, ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত নিরীক্ষার নীতিমালা সম্পর্কে স্বচ্ছন্দ ও কার্যকর দক্ষতা থাকতে হবে। একই সঙ্গে তাঁকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে পারদর্শী হতে হবে এবং ইআরপি (উজচ) প্ল্যাটফর্ম, উন্নত এক্সেল, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুলস, ডিজিটাল নিরীক্ষা প্রযুক্তি এবং ক্লাউডভিত্তিক সিস্টেম ব্যবহারে সক্ষম হতে হবে।

লিখিত ও মৌখিক উভয় ধরনের যোগাযোগ দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আর্থিক পেশাজীবীদের জটিল তথ্য সহজবোধ্য ভাষায় আর্থিক-বহির্ভূত অংশীজনদের সামনে উপস্থাপন করতে হয় এবং কার্যকরভাবে দল পরিচালনাও করতে হয়। করপোরেট আইন, ব্যাংকিং আইন, শ্রম আইন এবং সুশাসনসংক্রান্ত বিধিবিধান সম্পর্কে দৃঢ় নিয়ন্ত্রক সচেতনতাও সমানভাবে জরুরি।

এসবের পাশাপাশি, সমন্বিত আর্থিক পেশাজীবীর অবশ্যই কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে–যার মাধ্যমে তিনি বাজারের সংকেত বিশ্লেষণ করতে, ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস দিতে, ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিদীপ্তভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হন।

এমন পেশাজীবী বাংলাদেশের মতো দেশে অত্যন্ত অপরিহার্য, যেখানে অর্থনীতি দ্রুত বহুমুখী হয়ে উঠছে। রপ্তানিমুখী শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই), প্রযুক্তি স্টার্টআপ, এনজিও, উন্নয়ন প্রকল্প এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো–সবাই এমন আর্থিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অনুভব করে, যারা জটিল নিয়ন্ত্রক কাঠামো, ডিজিটাল ইকোসিস্টেম এবং আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও দক্ষভাবে কাজ করতে পারেন।

দেশটি যখন ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে, তখন শক্তিশালী আর্থিক সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা অপরিহার্য শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। সমন্বিত পেশাজীবীরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইন ও বিধিবিধান মেনে চলা, ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং বিশ্বাসযোগ্য কর্মদক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি প্রদান করেন।

আর্থিক খাতে ডিজিটাল রূপান্তর–যা অনলাইন ব্যাংকিং, ফিনটেক সেবা, মোবাইল আর্থিক প্ল্যাটফর্ম এবং তথ্যভিত্তিক করপোরেট কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে–এটি ইঙ্গিত দেয় যে আর্থিক পেশাজীবীদের এখন আইটি পেশাজীবীদের মতোই প্রযুক্তিনিপুণ হতে হবে। একই সঙ্গে, বৈশ্বিক শ্রমবাজারে চলাচলের সক্ষমতা দাবি করে যে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের বহুমাত্রিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে, যাতে তারা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং এশিয়ার বাজারে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারেন, যেখানে নিয়োগদাতারা বৈচিত্র্যময় দক্ষতার সেট প্রত্যাশা করেন।

বাংলাদেশকে তাই দক্ষতা উন্নয়নকে একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত কাঠামোর মাধ্যমে নতুনভাবে ভাবতে হবে। একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিল্পখাতের অংশীদার এবং পেশাগত সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন করতে হবে। বাস্তবভিত্তিক কেস স্টাডি, সিমুলেশন, শিল্পভিত্তিক ইন্টার্নশিপ, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা, আর্থিক মডেলিং কর্মশালা এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্স ল্যাবসমূহকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইআরপি (উজচ) সফটওয়্যার, অ্যানালিটিক্স টুলস এবং ডিজিটাল রিপোর্টিং সিস্টেমে সজ্জিত ফাইন্যান্স ইনোভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা চাকরির বাজারে প্রবেশের আগে বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ পায়। বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার পরিবর্তে, পেশাগত সংস্থাগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে এমন সমন্বিত সনদপথ (ইন্টিগ্রেটেড সার্টিফিকেশন পাথওয়ে) তৈরি করতে হবে, যা একাডেমিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতার সমন্বয় ঘটায়।

সরকারি সংস্থাগুলোকেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে জাতীয় আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচিকে সমর্থন করে, সক্ষমতা উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং শিল্প-শিক্ষা সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে, যাতে অংশীজনদের মধ্যে ধারাবাহিক যোগাযোগ নিশ্চিত হয়।

সমন্বিত আর্থিক পেশাজীবী তৈরি করা জাতীয় অর্থনীতির জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে উপকারী হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো আরও শক্তিশালী আর্থিক সুশাসন, উন্নত স্বচ্ছতা এবং কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুবিধা পাবে। বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলো, যেগুলো প্রায়ই আর্থিক অব্যবস্থাপনার কারণে বিলম্ব এবং ব্যয় বৃদ্ধির সমস্যায় পড়ে, সেগুলো আরও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হবে।

বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের করপোরেট পরিবেশের প্রতি আরও বেশি আস্থা অর্জন করবেন, যার ফলে বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। কর্মশক্তি আরও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার উপযোগী হয়ে উঠবে, যা আন্তর্জাতিক কর্মজীবনের সুযোগও প্রসারিত করবে। পরিশেষে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ এবং আরও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে আর্থিক পেশাজীবী তৈরির প্রচলিত পদ্ধতিগুলো আর আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সমন্বিত আর্থিক পেশাজীবীর প্রয়োজন এখন অত্যন্ত জরুরি ও তাৎক্ষণিক। এই নতুন ধরনের পেশাজীবী গড়ে তুলতে হলে এমন একটি পুনর্গঠিত পদ্ধতি প্রয়োজন, যা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং শিল্পখাতের চাহিদাকে একটি সুসংহত ব্যবস্থার মধ্যে একত্রিত করে।

যদি বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাগত সংস্থা, শিল্পখাতের নেতৃবৃন্দ এবং নীতিনির্ধারকেরা একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একসঙ্গে কাজ করেন, তবে বাংলাদেশ এমন একটি কর্মশক্তি গড়ে তুলতে পারবে, যা উদ্ভাবনকে সমর্থন করতে, সুশাসনকে শক্তিশালী করতে এবং টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হবে। সমন্বিত আর্থিক পেশাজীবীরা বাংলাদেশের অন্যতম মূল্যবান জাতীয় সম্পদে পরিণত হতে পারেন–যারা দেশকে আরও সমৃদ্ধ, জবাবদিহিমূলক এবং বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ■

অর্থনীতিতে স্ট্যাগফ্লেশনের মুখোমুখি বাংলাদেশ

মাসুমুর রহমান খলিলী
সিনিয়র সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

অর্থনীতিতে স্ট্যাগফ্লেশন (Stagflation) বা স্থবির-স্ফীতি এমন একটি জটিল পরিস্থিতি, যেখানে একই সাথে তিনটি নেতিবাচক ঘটনা ঘটে: অর্থনৈতিক স্থবিরতা বা মন্দা (জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া); উচ্চ মূল্যস্ফীতি (নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশচুম্বী দাম) এবং উচ্চ বেকারত্ব (কর্মসংস্থানের তীব্র অভাব)।

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি পুরোপুরি স্ট্যাগফ্লেশনে পতিত না হলেও, সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেশে স্ট্যাগফ্লেশনের ঝুঁকি বা আশঙ্কা বেশ প্রকট।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্ট্যাগফ্লেশনের আশঙ্কা ও এর পেছনের নানা কারণ রয়েছে।

স্ট্যাগফ্লেশনের আশঙ্কার প্রধান সূচকসমূহ

বিশ্বব্যাংক, এডিবি (এডিবি) এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সাম্প্রতিক (২০২৬) অর্থনৈতিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, বাংলাদেশ মূলত দুটি প্রধান সংকটের মুখোমুখি, যা স্ট্যাগফ্লেশনের লক্ষণ প্রকাশ করে:

ক) দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ মূল্যস্ফীতি (High Inflation)

স্ট্যাগফ্লেশনের প্রথম শর্তই হলো লাগামহীন মূল্যস্ফীতি। বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর ধরে মূল্যস্ফীতি ৮% থেকে ১০% এর ঘরে আটকে আছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালেও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির দেশ বাংলাদেশ। জ্বালানি সংকট, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের ওঠানামা এবং অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

বিবিএসের সর্বশেষ (২০২৬ সালের এপ্রিল) তথ্য অনুযায়ী, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ৯.০৪% । জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ (যেমন ভারত বা শ্রীলঙ্কা) যেখানে তাদের মূল্যস্ফীতি ৫% বা তার নিচে নামিয়ে এনেছে, সেখানে বাংলাদেশ গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে ৮% থেকে ১০%-এর বৃত্তে আটকে আছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, সরকারি হিসাবে মূল্যস্ফীতি ৯% বলা হলেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচের বাজারে (বিশেষ করে চাল, ডাল, তেল, আলু ও পেঁয়াজের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে) এটি বাস্তবে ১৫% থেকে ২০% ছাড়িয়ে গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ও পরিবহণ খরচ বেড়েছে। বাংলাদেশ আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়ায় এর সরাসরি প্রভাব বিদ্যুৎ, পরিবহণ এবং উৎপাদন খরচে পড়ছে। ডলারের বিপরীতে টাকার মান রেকর্ড পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে আমদানিকৃত যেকোনো কাঁচামাল বা পণ্যের দাম দেশের বাজারে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে।

বাজার সিন্ডিকেট ও দুর্বল তদারকিও মূল্যস্ফীতির অন্যতম কারণ। সরবরাহ লাইনে কৃত্রিম সংকট তৈরি এবং কোল্ড স্টোরেজ বা পাইকারি পর্যায়ে শক্তিশালী ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারণে অনেক সময় দেশীয় পণ্যের দামও সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

নীতিগত ব্যর্থতা ও সমন্বয়হীনতাও এ জন্য দায়ী। সুদের হার বৃদ্ধি বা কিছু পণ্যের শুল্ক কমানোর মতো মুদ্রানীতি ও রাজস্ব পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, প্রশাসনিক তদারকির অভাব এবং অস্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষ তার সুফল পাচ্ছে না।

সাধারণ মানুষের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। গত দুই বছরে সাধারণ চাকরিজীবী, দিনমজুর বা মধ্যবিত্তের আয় যে হারে বেড়েছে, নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। ফলে সাধারণ মানুষের "প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা" মারাত্মকভাবে কমে গেছে। নিম্ন ও নির্দিষ্ট আয়ের পরিবারগুলো ডিম, মাছ বা মাংসের মতো প্রোটিন জাতীয় খাবার কেনা কমিয়ে ডাল-ভাতের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছে। চিকিৎসা, সন্তানদের পড়াশোনা এবং বিনোদনের খরচ কাটছাঁট করে মানুষ শুধু টিকে থাকার জন্য দৈনিক খাদ্যের পেছনে আয়ের সিংহভাগ ব্যয় করছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, শুধু সুদের হার বাড়িয়ে বা ব্যাংকিং নীতি দিয়ে এই লাগামহীন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়; এর জন্য ডলার বাজারের স্থিতিশীলতা, চাঁদাবাজি ও বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের সাথে মিল রেখে দূরদর্শী জ্বালানি নীতি গ্রহণ করা জরুরি।

খ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধীরগতি (Economic Slowdown)

স্ট্যাগফ্লেশনের দ্বিতীয় শর্ত হলো প্রবৃদ্ধির স্থবিরতা। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি (এউচ) প্রবৃদ্ধি কমে ৩.৯% থেকে ৪.৬% এর মধ্যে নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ কয়েক বছর আগেও এই হার ৭% এর ওপরে ছিল। বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়া, আমদানিতে কড়াকড়ি এবং ডলার সংকটের কারণে শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে।

অবশ্য গত দেড় দশকে (২০০৯-২০২৪) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান নিয়ে অর্থনীতিবিদ, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন থিঙ্কট্যাঙ্ক এবং নীতি-গবেষকদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক ও প্রশ্ন ছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার পর দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির যে "শ্বেতপত্র" এবং পুনর্মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলো সামনে এসেছে, তাতে স্পষ্ট যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে অতিমূল্যায়ন বা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছিল।

সাধারণত একটি দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়লে তার সাথে সংগতি রেখে বিদ্যুৎ ব্যবহার, ব্যাংকিং ঋণ, আমদানি-রপ্তানি এবং রাজস্ব আদায় বাড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে উল্টো চিত্র।

গত দেড় দশকের শেষভাগে সরকারিভাবে প্রবৃদ্ধির হার ৭% থেকে ৮% দাবি করা হচ্ছিল। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং স্যানেম বা সিপিডির মতো স্থানীয় সংস্থার স্বাধীন বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ওই সময়ে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল মূলত ৪.৫% থেকে ৫.৫%-এর ঘরে। অর্থাৎ, প্রতি বছর গড়ে ১.৫% থেকে ২.৫% পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

এই অতিমূল্যায়ন এর একটি পদ্ধতিগত কারণ হলো- রাজনৈতিক বয়ান ও "উন্নয়নের গল্প"। তৎকালীন

সরকারের মূল রাজনৈতিক বয়ানই ছিল "উন্নয়ন"। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে "উন্নয়নের রোল মডেল" হিসেবে উপস্থাপন করতে জিডিপির প্রবৃদ্ধিকে একটি বড় হাতিয়ার করা হয়েছিল। উপাত্তের রাজনীতিকীকরণও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) স্বায়ত্তশাসিতভাবে কাজ করতে পারেনি। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আগেই নির্ধারণ করে দেওয়া হতো এবং সেই লক্ষ্য মেলাতে বিবিএসের তথ্যকে ম্যানিপুলেট বা সমন্বয় করার অভিযোগ রয়েছে।

৩টি অসঙ্গতি অতিমূল্যায়নকে প্রমাণ করে। প্রথ মত,সাধারণভাবে জিডিপি বাড়লে রাজস্ব আদায় বাড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো-বাংলাদেশে ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত ছিল ৮% থেকে ৯%, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। প্রবৃদ্ধি বাড়লে রাজস্ব এত কম হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়ত,উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ লাফিয়ে বাড়ে। এক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো-বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ২২% থেকে ২৩%-এর ঘরে বছরের পর বছর আটকে ছিল, যা স্থবিরতার লক্ষণ। তৃতীয়ত,উচ্চ প্রবৃদ্ধির অর্থ হলো বিপুল কর্মসংস্থান। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। এই সময়কালকে অর্থনীতিবিদরা "কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি" (Jobless Growth) বলে আখ্যা দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে প্রবৃদ্ধির খাতা-কলমের হিসাব কৃত্রিম ছিল।

কৃত্রিমভাবে জিডিপি বড় দেখানোর খেসারত এখন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দিতে হচ্ছে। এতে ভুল নীতি নির্ধারণে জিডিপি বেশি দেখিয়ে দেশ মধ্যম আয়ের দিকে যাচ্ছে দাবি করে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চড়া সুদে এবং স্বল্প মেয়াদে কঠিন শর্তে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হয়েছে। এখন সেই ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে রিজার্ভের ওপর তীব্র চাপ পড়ছে।

প্রবৃদ্ধির কৃত্রিম বেলুন ফুললেও সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় বাড়েনি। ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান (গিনি কোফিসিয়েন্ট) রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। ডেটার এই কারচুপির কারণে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো (যেমন Moody's, S&P) বাংলাদেশের রেটিং কমিয়ে দিয়েছে, যা বিদেশি বিনিয়োগ এবং এলসি (খঈ) খোলার খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে।

গত দেড় দশকে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির অতিমূল্যায়ন ছিল মূলত একটি "রাজনৈতিক বিভ্রম"। খাতা-কলমে দেশকে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি দেখানো হলেও, ভেতরে ভেতরে ব্যাংকিং খাতের ভঙ্গুরতা, খেলাপি ঋণ ও অর্থ পাচার সামষ্টিক অর্থনীতিকে ফাপা করে দিয়েছিল–যার ধাক্কা ২০২৪-২০২৬ সালের অর্থনৈতিক মন্দায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ রেকর্ড ৩০% ছাড়িয়েছে। মূলধন ঘাটতির কারণে ব্যাংকগুলো নতুন ব্যবসায়ীদের ঋণ দিতে পারছে না, ফলে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য ও আর্থিক নিরীক্ষা অনুযায়ী, ব্যাংক খাতে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫ লাখ ৫৭ হাজার কোটি টাকা (২০২৫ সালের ডিসেম্বর শেষে হালনাগাদ) এটি দেশের ব্যাংক খাতের মোট বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৩০.৬% (৩০ দশমিক ৬০ শতাংশ)২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে কাগজে-কলমে খেলাপি ঋণ দেখানো হয়েছিল ২.১১ লাখ কোটি টাকা। তবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুনঃমূল্যায়ন এবং বিদেশি খাতের অডিট দলগুলোর নিখুঁত তদন্তের পর আরও প্রায় ৪.৩৩ লাখ কোটি টাকার 'লুকানো বা গোপন' ব্যাড লোন (Bad Loans) বা প্রকৃত খেলাপি ঋণ সামনে আসে। ফলে এটি সর্বোচ্চ ৬.৪৪ লাখ কোটি টাকা পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল, যা পরবর্তীতে বিশেষ পুনঃতফসিলীকরণ সুবিধার পর বর্তমানে ৫.৫৭ লাখ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঝুঁকির মূল জায়গা হলো- খেলাপি ঋণ কিছুটা পুনঃতফসিল করা হলেও ব্যাংকগুলোর নিরাপত্তা সঞ্চিতি বা প্রভিশন ঘাটতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। খেলাপি ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর যেখানে প্রভিশন রাখার কথা ছিল, সেখানে মাত্র ২.৪৯ লাখ কোটি টাকা রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে ব্যাংক খাতে এখনো প্রায় ১.৯১ লাখ কোটি টাকার প্রভিশন ঘাটতি রয়ে গেছে, যা আমানতকারীদের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করছে।

মূলত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্ত ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (তিন মাস পেমেন্ট না দিলেই খেলাপি করার নিয়ম) পুরোপুরি কার্যকর করার কারণে এখন ব্যাংকিং খাতের প্রকৃত খাদের গভীরতা বা আসল খেলাপি ঋণের চিত্রটি স্পষ্ট হচ্ছে।

গ) ছদ্মবেকারত্ব ও মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের অভাব

যদিও সরকারি হিসাবে বেকারত্বের হার কম দেখানো হয়, কিন্তু বাস্তব চিত্রে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি প্রায় থমকে গেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও ব্যবসায়িক মন্দার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মী ছাঁটাই করছে বা নতুন নিয়োগ বন্ধ রেখেছে, যা স্ট্যাগফ্লেশনের তৃতীয় লক্ষণকে উস্কে দিচ্ছে। বাংলাদেশে "প্রকৃত" বেকারত্বের হার কত–তা নিয়ে সরকারি পরিসংখ্যান এবং অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর হিসাবের মধ্যে বড় ধরনের অমিল রয়েছে। এর মূল কারণ হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বেকারের সংজ্ঞা এবং বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যকার পার্থক্য।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সংজ্ঞা অনুযায়ী বেকারত্ব পরিমাপ করে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী–যদি কোনো ব্যক্তি গত ৭ দিনে অন্তত ১ ঘণ্টাও মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন এবং সক্রিয়ভাবে চাকরি খোঁজেন, তবে তাকে বেকার ধরা হয়। এতে সাধারণ বেকারত্বের হার: ৪.৫% থেকে ৪.৮% (বিবিএসের সর্বশেষ ত্রৈমাসিক জরিপ অনুযায়ী দেশে নিবন্ধিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ২৬ থেকে ৩৫ লাখ)। কিন্তু উদ্বেগজনক বিষয় হলো-এই আইএলও-র "১ ঘণ্টার" সংজ্ঞার মারপ্যাঁচে দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী

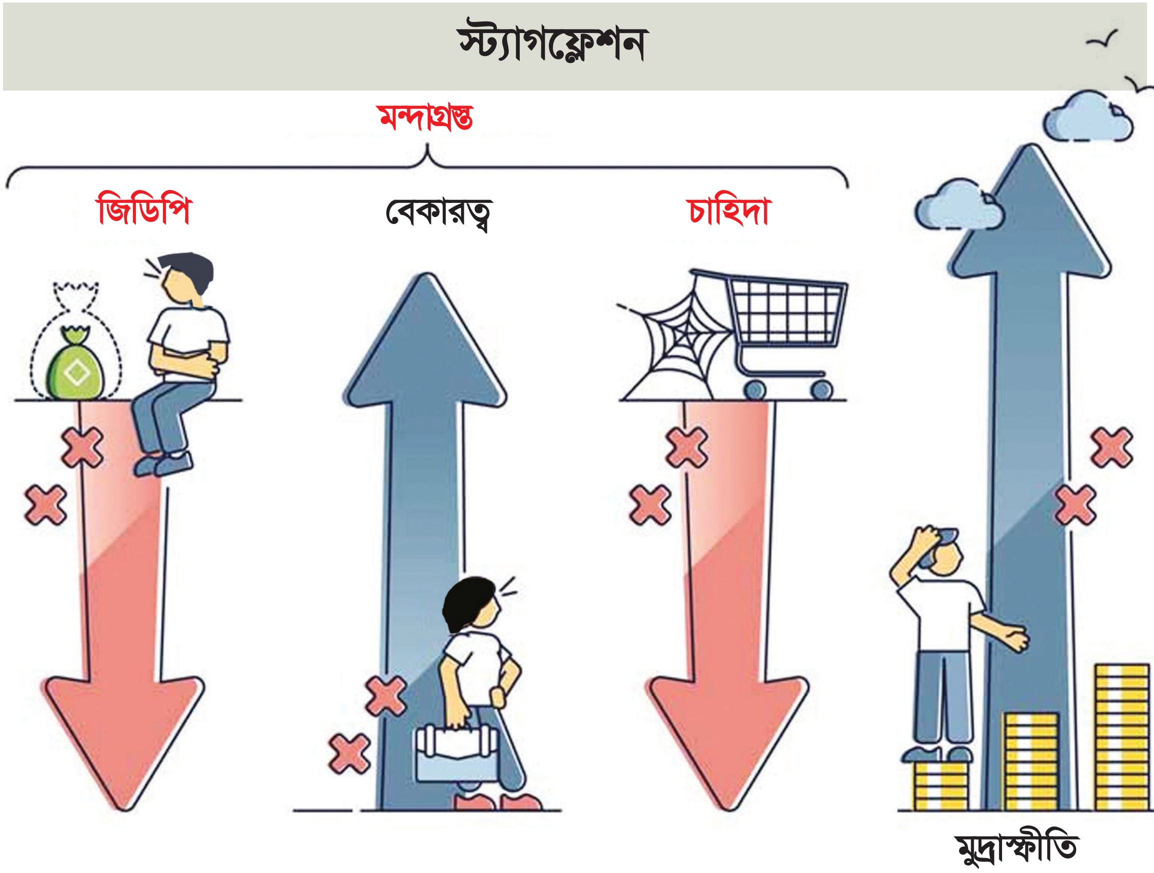

সরকারি হিসাবে বেকারের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। অর্থনীতিবিদ ও বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রকৃত কর্মসংস্থান সংকটের চিত্রটি অনেক বেশি ভয়াবহ।

বিশ্বব্যাংকের ২০২৬ সালের মার্চ মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত এক দশকে ১ কোটি ৪০ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র ৮৭ লাখ। অর্থাৎ, প্রায় ৫৩ লাখ কর্মক্ষম তরুণ সম্পূর্ণ বেকার।

স্নাতক (অনার্স) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপ অনুযায়ী, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এই হার ১৫.৭% থেকে ১৯.২% পর্যন্ত। কিছু কিছু বেসরকারি গবেষণা বলছে, এটি ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত স্পর্শ করেছে।

এছাড়া দেশে প্রায় ১ কোটির কাছাকাছি মানুষ রয়েছে যারা মনমতো কাজ পায় না। তারা টিকে থাকার জন্য হকার, রাইড শেয়ারিং বা দৈনিক মজুরির মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাজ করে। এদের বলা হয় "আংশিক বেকার" বা "ছদ্মবেকার"।

কেন প্রকৃত বেকারত্ব এত বেশি সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর একটি কারণ হলো-শিক্ষাব্যবস্থা ও বাজারের অমিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর করপোরেট বা চাকরির বাজারের চাহিদার সাথে দক্ষতার মিল না থাকা। অনানুষ্ঠানিক খাতের ওপর চাপও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের প্রায় ৮৫% কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক (Informal) খাতে, যেখানে চাকরির কোনো স্থায়িত্ব বা স্থায়ী বেতন নেই। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও অটোমেশনের বিস্তারের কারণে নতুন কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়েছে। একই সাথে পোশাক খাতে আন্তর্জাতিক মন্দার কারণেও অনেকেই কাজ হারিয়েছেন।

সরকারি খাতা-কলমে বেকারত্বের হার ৪.৮% বা ২৬-৩৫ লাখ বলা হলেও, বাস্তবে ছদ্মবেকার, শিক্ষিত বেকার এবং সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা কাজ করা আংশিক বেকারদের হিসাব যোগ করলে বাংলাদেশে প্রকৃত কর্মসংস্থানহীন বা বেকার মানুষের সংখ্যা ১ কোটির কাছাকাছি বা তার চেয়েও বেশি।

স্ট্যাগফ্লেশন: সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিস্থিতি

অর্থনীতিতে স্ট্যাগফ্লেশন বা স্থবির-স্ফীতিকে সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিস্থিতি বলা হয়। কারণ এটি সাধারণ মানুষের আয়ের পথ বন্ধ করে দেয়, আবার অন্যদিকে বেঁচে থাকার খরচ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ, যাদের আয়ের উৎস সীমিত, তারা এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি পিষ্ট হয়।

যদি কোনো দেশে স্ট্যাগফ্লেশন দীর্ঘায়িত হয়,তবে নিম্নবিত্ত

মানুষের ওপর প্রভাব পড়ে বেশি,তাদের বেঁচে থাকার লড়াই তীব্র হয়। নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো তাদের আয়ের সিংহভাগ (প্রায় ৭০-৮০%) খরচ করে চাল, ডাল, তেল ও লবণের মতো মৌলিক খাদ্যসামগ্রী কিনতে। স্ট্যাগফ্লেশন তাদের জীবনকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে। বাজারে নিত্যপণ্যের দাম বাড়লেও তাদের দৈনিক মজুরি বাড়ে না। ফলে, তারা খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। মাছ-মাংস তো দূরের কথা, তিন বেলা পেট ভরে ভাত খাওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে, যা মারাত্মক পুষ্টিহীনতা তৈরি করে।

দৈনিক খরচ মেলাতে না পেরে তারা স্থানীয় মহাজন বা চড়া সুদে এনজিও থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। আয়ের স্থবিরতার কারণে এই ঋণ শোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তারা চিরস্থায়ী ঋণের ফাঁদে আটকে যায়। আয়ের চরম সংকটে পড়ে এই শ্রেণির মানুষ অসুস্থ হলেও ডাক্তার দেখায় না বা ওষুধ কেনা বন্ধ করে দেয়। সন্তানকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে শিশুশ্রমে নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়।

মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর প্রভাবে দেখা যায়-"নীরব হাহাকার" ও সামাজিক পতন। মধ্যবিত্তদের সংকটটা একটু ভিন্ন ও নীরব। তারা লোকলজ্জার ভয়ে না পারেন কারও কাছে হাত পাততে, না পারেন লাইনে দাঁড়িয়ে সাহায্য নিতে। ধরা যাক একজন মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর বেতন ৫০,০০০ টাকা। স্ট্যাগফ্লেশনের কারণে যদি জীবনযাত্রার ব্যয় ২০% বাড়ে, তবে তার বেতনের ক্রয়ক্ষমতা কমে দাঁড়ায় ৪০,০০০ টাকায়। অর্থাৎ, কাগজে-কলমে বেতন এক থাকলেও বাস্তবে তার আয় কমে যায়।

খরচ সামলাতে মধ্যবিত্তরা তাদের বহুদিনের অভ্যাস ও জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। যেমন: ভালো বাসা ছেড়ে কম ভাড়ার ছোট বাসায় বা শহরতলীতে চলে যাওয়া। সন্তানকে দামি ইংরেজি মাধ্যম বা ভালো প্রাইভেট স্কুল থেকে সরকারি বা কম খরচের স্কুলে সরিয়ে নেয়। যাতায়াতে উবার/পাঠাও বা সিএনজির বদলে লোকাল বাস ব্যবহার করে।

স্ট্যাগফ্লেশনের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ হলো–এর ফলে সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যায়। সঞ্চয় ফুরিয়ে যাওয়ায় সামান্য আঘাতেই (যেমন পরিবারের কারও অসুস্থতা) তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

মন্দার কারণে কোম্পানিগুলো কর্মী ছাঁটাই করে। চাকরি হারানোর সার্বক্ষণিক ভয় মানুষের মধ্যে তীব্র মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা এবং পারিবারিক অশান্তি বাড়িয়ে দেয়। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য জমানো সঞ্চয় বা ডিপিএস ভেঙে প্রতিদিনের খরচ চালাতে হয়। ফলে বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা বা সন্তানের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন ভেস্তে যায়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সমাজে চুরি, ছিনতাই, প্রতারণা এবং পারিবারিক সহিংসতার মতো অপরাধ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়।

অর্থনীতিবিদদের মতে: "মূল্যস্ফীতি হলো একটি অদৃশ্য কর, যা সাধারণ মানুষের পকেট থেকে টাকা চুরি করে। আর স্ট্যাগফ্লেশন হলো সেই চোর, যে শুধু পকেটই কাটে না, একই সাথে মানুষের উপার্জনের হাত দুটোও ভেঙে দেয়।"

বাংলাদেশের জন্য প্রধান ঝুঁকিসমূহ

স্ট্যাগফ্লেশন বা অর্থনৈতিক মন্দার মতো কঠিন সময়ে রাষ্ট্রীয় পলিসি পরিবর্তন হতে সময় লাগে, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সঠিক কৌশল গ্রহণ করলে পরিবারকে বড় ধরণের আর্থিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য টিকে থাকার মূলমন্ত্র হলো–"খরচ কমানো, সঞ্চয় রক্ষা করা এবং আয়ের বিকল্প উৎস খোঁজা।"

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (WEF) গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্ট ২০২৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জন্য প্রধান ঝুঁকিগুলোর অন্যতম হলো অর্থনৈতিক ধীরগতি ও উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এই পরিস্থিতিকে স্ট্যাগফ্লেশনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে নিচের কারণগুলো:

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত: মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার অস্থির। এর ফলে বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানি ব্যয় ও ভর্তুকির চাপ বাড়ছে, যা মূল্যস্ফীতিকে আরও উস্কে দিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক ঝুঁকি তৈরি করছে, যার প্রভাব প্রধানত তিনটি খাতে দৃশ্যমান:

জ্বালানি তেল ও মূল্যস্ফীতি: হরমুজ প্রণালী বা লোহিত সাগরে অস্থিরতার কারণে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে বাংলাদেশের আমদানি খরচ এক লাফে বেড়ে যায়। এর ফলে দেশের ভেতরে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি পায়, যা সরাসরি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারকে উত্তপ্ত করে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়ায়।

রেমিট্যান্স প্রবাহ: বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের সিংহভাগ (প্রায় ৬০-৭০%) আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে প্রবাসীদের কর্মসংস্থান ও আয় ঝুঁকির মুখে পড়ে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

রপ্তানি ও লজিস্টিকস খরচ: লোহিত সাগরে সংঘাতের কারণে সুয়েজ খাল এড়িয়ে দীর্ঘ পথে জাহাজ চলাচলের ফলে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণ ভাড়া (Freight Cost) এবং সময় দুটোই বেড়েছে। এটি তৈরি পোশাকসহ ইউরোপ-আমেরিকায় বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে।

সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ডলার সংকট আরও ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ■

কাশ্মীর

যেখানে সমাহিত হাজারো প্রতিশ্রুতি

গোলাম নবী ফাই, পিএইচডি
চেয়ারম্যান, ওয়ার্ল্ড ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস
আমেরিকা

এই ট্র্যাজেডির শিকড় প্রোথিত রয়েছে অমৃতসর চুক্তির গভীরে, যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কাশ্মীর এবং এর জনগণকে মহারাজা গুলাব সিংহের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল যেন তারা নিছক কোনো পণ্য। সাম্রাজ্যবাদী সুবিধাবাদের এই পদক্ষেপ এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, যেখানে কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছাকে বারবার রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে অধীনস্থ বা বলি করা হয়েছে।

রাজকীয় শাসনামলে কাশ্মীর চরম বৈপরীত্যের এক ভূমিতে পরিণত হয়েছিল–যা সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদে সমৃদ্ধ হলেও নিপীড়নের বোঝায় জর্জরিত ছিল। এখানকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা পদ্ধতিগত বৈষম্য, ভারী কর আরোপ এবং রাজনৈতিক বর্জনের মুখোমুখি হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদগুলো প্রায়শই নির্মমতার সাথে দমন করা হতো, যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ১৯৩১ সাল, যখন ২২ জন বিক্ষোভকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঔপনিবেশিক শক্তি যারা একসময় 'সভ্য করার মিশন'-এর দাবি করেছিল, তারা এই

প্রাথমিক অন্যায়গুলোর প্রতি চরম উদাসীনতা দেখিয়েছিল; যা ছিল ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতির দীর্ঘ তালিকার প্রথম অধ্যায়।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কোনো সমাধান বয়ে আনেনি; বরং তা বিশ্বাসঘাতকতাকে আরও গভীর করেছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলোকে যখন ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার অথবা স্বাধীন থাকার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল–তখন জওহরলাল নেহরুসহ অন্যান্য নেতাদের ঘোষিত মূল নীতিটি ছিল যে, বিতর্কিত ক্ষেত্রগুলোতে জনগণের ইচ্ছারই জয় হতে হবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং হিন্দু শাসক নিয়ে কাশ্মীর ছিল এই নীতির সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। কিন্তু যখন সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মুহূর্তটি এলো, তখন সেই প্রতিশ্রুতি কর্পূরের মতো উবে গেল।

১৯৪৭ সালের অক্টোবরে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘের কাছে করা তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ৪৭ নম্বর প্রস্তাব (২১ এপ্রিল, ১৯৪৮) পাস হয়, যা কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গণভোটের আহ্বান জানিয়েছিল। এই অঙ্গীকারের কথা নেহরু নিজে জনসমক্ষে বারবার পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন এবং আন্তর্জাতিকভাবেও তা সমর্থিত হয়েছিল। তবে, রাজনৈতিক বাস্তবতা পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতের অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। যে বিষয়টিকে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা এক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত দায়িত্বে পরিণত হয়।

প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং তা থেকে সরে আসার এই ধারা অব্যাহত ছিল। ১৯৬৬ সালের তাশখন্দ চুক্তি থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের শিমলা চুক্তি এবং ১৯৯৯ সালের লাহোর ঘোষণা পর্যন্ত–প্রতিটি কূটনৈতিক উদ্যোগই কাশ্মীরের বিষয়ে একটি অর্থপূর্ণ আলোচনার প্রতিশ্রুতি বহন করেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অচলাবস্থাতেই শেষ হয়, যেখানে মূল সমস্যাটিকে স্থগিত বা একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

স্বায়ত্তশাসন খর্ব হওয়া ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। ২০১৯ সালে ৩৭০ এবং ৩৫-এ অনুচ্ছেদ বাতিল করার ঘটনাটিকে কেবল একটি সাংবিধানিক পরিবর্তন হিসেবেই দেখা হয়নি, বরং এটিকে নামমাত্র বা প্রতীকী স্বায়ত্তশাসনেরও চূড়ান্ত অবসান হিসেবে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয়েছিল। এর পর পর ঘটে যাওয়া ব্যাপক প্রশাসনিক, জনসংখ্যার কাঠামো পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক রূপান্তর স্থানীয় জনগণকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে তোলে এবং আন্তর্জাতিক উদ্বেগ বৃদ্ধি করে।

আজ, একের পর এক ঘটে যাওয়া এই বিশ্বাসভঙ্গের কারণে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কাশ্মীর এখনও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সামরিকীকৃত অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জোরপূর্বক গুম এবং খেয়ালখুশিমতো আটকে রাখাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন অভিযোগ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো সংস্থাগুলো দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছে। কঠোর বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (UAPA)-এর অধীনে মোহাম্মদ ইয়াসিন মালিক, শাবির আহমেদ শাহ এবং মাসারাত আলম ভাটের মতো রাজনৈতিক নেতা; খুররম পারভেজ, আসিয়া আন্দ্রাবি, সোফি ফাহমিদা এবং নাহিদা নাসরিনের মতো মানবাধিকার কর্মী এবং ইরফান মেহরাজের মতো সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের আটকাদেশ ভিন্নমত এবং গণতান্ত্রিক প্রকাশের সুযোগ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা–অথবা বেছে বেছে সাড়া দেওয়া–সমানভাবে উদ্বেগজনক। বৈশ্বিক মনোযোগ যখন একের পর এক সংকটের মাঝে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন কাশ্মীর পারমাণবিক ঝুঁকির এক অমীমাংসিত সংকট হিসেবেই রয়ে গেছে। এমনকি বিশ্বনেতাদের মাঝে মাঝে দেওয়া স্বীকৃতিও, যেমন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২৫ সালের ১০ মে'র মন্তব্য যে কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি বড় সংঘর্ষবিন্দু (ফ্ল্যাশপয়েন্ট) হিসেবে রয়ে গেছে, কোনো টেকসই কূটনৈতিক পদক্ষেপে রূপ নেয়নি।

ইতিহাস আমাদের দেখায় যে অধিকার খর্ব করার মাধ্যমে যে সংকটগুলোর জন্ম হয়, তা সহজে মুছে যায় না; সঠিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো টিকে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে উত্তর আয়ারল্যান্ডের মতো অন্যান্য সংগ্রামগুলোর শিক্ষা এটি স্পষ্ট করে দেয় যে–নিপীড়ন বা অস্বীকারের ওপর ভিত্তি করে কখনো স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত সংলাপ, অন্তর্ভুক্তি এবং জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

বৈশ্বিক আলোচনার গতিপ্রকৃতি বদলে যাওয়ার ক্ষীণ কিন্তু ক্রমবর্ধমান কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সংলাপ, আঞ্চলিক কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার জন্য নতুন করে ওঠা আহ্বানগুলো–তা যতই সাময়িক বা পরীক্ষামূলক হোক না কেন–এটিই ইঙ্গিত করে যে বর্তমান পরিস্থিতি মোটেও স্থিতিশীল বা টেকসই নয়। যেকোনো কার্যকর অগ্রগতির পথে অবশ্যই সব অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে: ভারত, পাকিস্তান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, কাশ্মীরের জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের। দীর্ঘকাল ধরে কাশ্মীরের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু কাশ্মীরের মানুষের সাথে সরাসরি কোনো আলোচনা করা হয়নি।

কাশ্মীরের ট্র্যাজেডি বা বিষাদান্তক ঘটনাটি কেবল এই কারণে নয় যে সেখানে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছিল, বরং তা করা হয়েছিল বারবার, জেনেবুঝে এবং কোনো জবাবদিহিতা ছাড়াই। আস্থা ফিরিয়ে আনতে কেবল ফাঁকা বুলি বা বাগাড়ম্বরের চেয়েও বেশি কিছুর প্রয়োজন–এর জন্য প্রয়োজন সাহস, সততা এবং অস্বস্তিকর সত্যের মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা। ততদিন পর্যন্ত, কাশ্মীর দীর্ঘকাল ধরে যা ছিল ঠিক সেটাই রয়ে যাবে : একটি বেদনাদায়ক অনুস্মারক যে–বিলম্বিত বিচার কেবল বিচারহীনতাই নয়, বরং এটি এমন এক ক্ষত যা সময়ের সাথে সাথে আরও গভীর হয়। ■

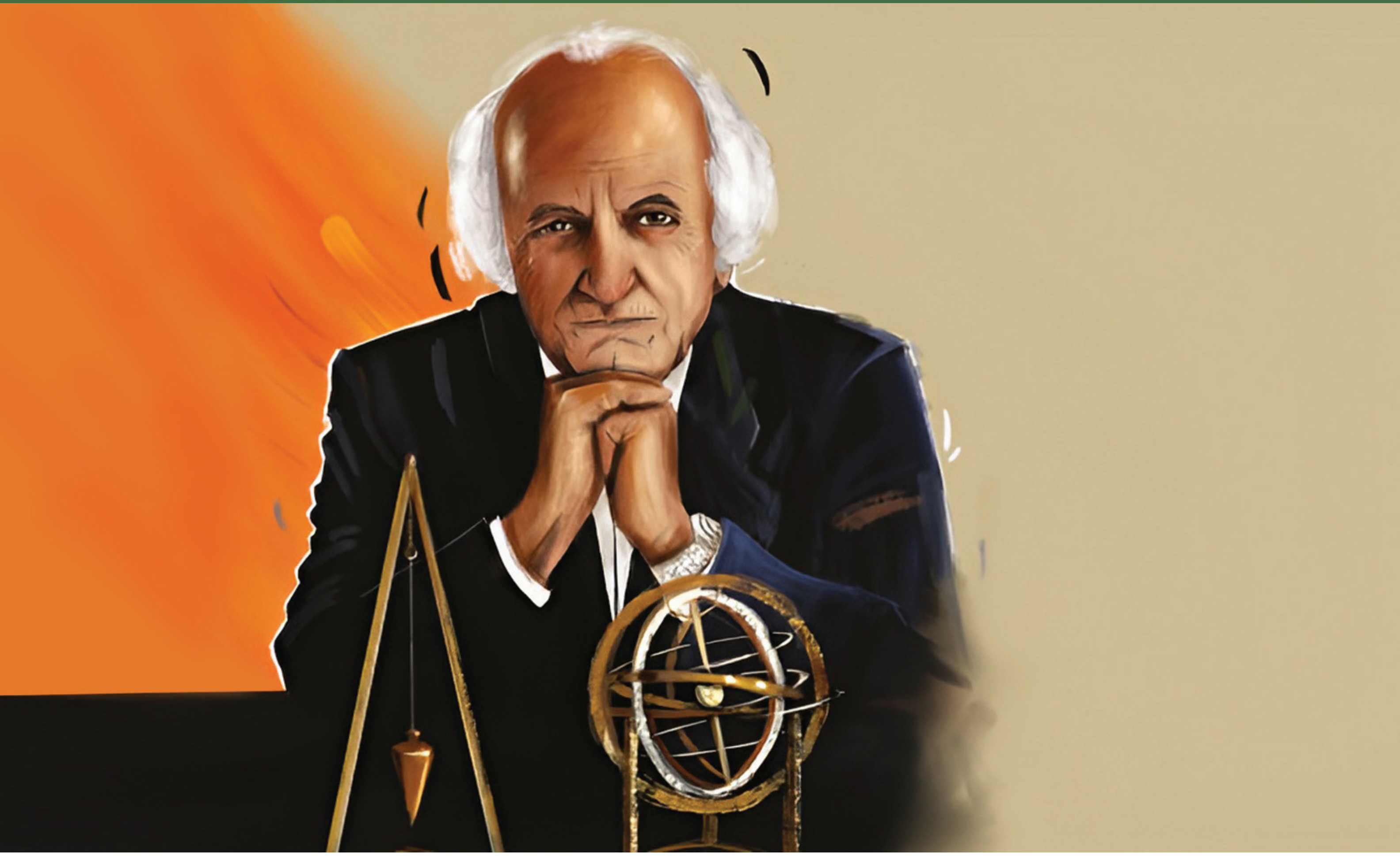

ফুয়াত সেজগিন

ইসলামি বিজ্ঞানের ইতিহাস পুনরুদ্ধারকারী ব্যক্তি

সাদ হাসান
এবং
মুরাত সোফুওগ্লু

৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফুয়াত সেজগিন বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং মুসলিম-আরবি বিজ্ঞানের ওপর জানা থাকা প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের একটি বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করেছেন, যার বেশিরভাগই পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদের কাজে লাগালেও পরবর্তীতে তা উপেক্ষা করেছে।

আমাদের সময়ের অন্যতম প্রথীতযশা ইসলামি বিজ্ঞান ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি আরবি সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি দিক অধ্যয়নের জন্য বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেছিলেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি হাজার হাজার বই সংগ্রহ করেছিলেন, যার মধ্যে কিছু ছিল অত্যন্ত দুর্লভ পাণ্ডুলিপি।

বিখ্যাত গ্রিক গণিতবিদ ডায়োফ্যান্টাস দীর্ঘকাল ধরে গবেষকদের কাছে এক রহস্য হয়ে আছেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় এবং তিনি খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দে নাকি ৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে বেঁচে ছিলেন, তা নিয়ে এখনও বিতর্ক রয়েছে। তবে যা নিশ্চিতভাবে জানা যায় তা হলো, তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি অ্যারিথমেটিকা (Arithmetica) রচনা করেছিলেন–যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংখ্যা তত্ত্ব এবং বীজগণিতে আগ্রহী যে কারও জন্য একটি আবশ্যিক পাঠ্য বই ছিল। কিন্তু, মধ্যযুগের রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের (যখন মুসলিম ও খ্রিস্টানরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল) বিশৃঙ্খলার মাঝে বইটির ১৩টি অধ্যায়ের মধ্যে ৭টি অধ্যায় হারিয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে, ইরানের মাশহাদের আস্তান কুদস লাইব্রেরিতে পুরোনো পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নের সময় সেজগিন একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় আবিষ্কার করেন।

নষ্ট হয়ে যাওয়া কাগজের বান্ডিলগুলোর মধ্যে লুকিয়ে ছিল ডায়োফ্যান্টাসের বইটির একটি আরবি অনুবাদ। এটি অনুবাদ করেছিলেন কুস্তা ইবনে লুকা–যিনি ছিলেন নবম শতাব্দীর বাগদাদের (যা তৎকালীন ইসলামি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল) একজন খ্রিষ্টান বহুভাষাবিদ ও পণ্ডিত। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা ডায়োফ্যান্টাসের গাণিতিক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা পেতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

১৯৭৫ সালে এই আবিষ্কৃত অধ্যায়গুলোর ওপর একটি গবেষণাপত্র (থিসিস) লেখা জাক সেসিয়ানো টিআরটি ওয়ার্ল্ড-কে বলেন, 'সেজগিনের খুঁজে পাওয়া অংশটি আমাদের দেখায় যে, ডায়োফ্যান্টাসের কাজটি মূলত এমন একটি বই ছিল যা থেকে প্রাচীনকালের শিক্ষার্থীরা বীজগণিতীয় পদ্ধতিতে সমাধান করার কৌশল শিখতে পারত। আর এটিই হয়তো ব্যাখ্যা করে যে, কেন ডায়োফ্যান্টাসের পূর্বসূরিদের কোনো কাজ আর টিকে থাকেনি।''

সেজগিন তুরস্ক, ইরান, মিশর, ভারত এবং আরও অনেক দেশের গ্রন্থাগারগুলো অনুসন্ধান করেছিলেন এবং স্বল্পপরিচিত লেখকদের লেখা কাগজপত্রের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি এমন একটি সংগ্রহ গড়ে তোলেন যা আজ আরবি সাহিত্যের সবচেয়ে বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি হিসেবে বিবেচিত হয়; যার মধ্যে কোরানিক বিজ্ঞান, ধর্মীয় মতবাদ, প্রাণিবিদ্যা এবং আলকেমি (প্রাচীন রসায়ন) থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিজ্ঞান ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর অর্জন এতই অসংখ্য: যার মধ্যে মানচিত্রকার পিরি রেইসের ওপর তাঁর গবেষণা থেকে শুরু করে দশম শতাব্দীর অ্যাস্ট্রোলেবের (জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীন যন্ত্র) অবিকল প্রতিরূপ নির্মাণের তত্ত্বাবধান পর্যন্ত রয়েছে। এমনকি তাঁর সমসাময়িক অনেকেরই ডায়োফ্যান্টাসের কাগজপত্র আবিষ্কারের বিষয়টি জানা ছিল না।

ইস্তাম্বুলের ফুয়াত সেজগিন ইনস্টিটিউটের ইসলামি ইতিহাসের অধ্যাপক পিটার স্টার বলেন, 'আপনি যদি আরবি ভাষায় লেখা কোনো লেখক, কোনো বই বা প্রাচীন কোনো কাজের কথা শোনেন এবং সে সম্পর্কে কিছু জানতে চান, তবে আপনার প্রথম কাজই হবে ফুয়াত সেজগিনের বইটির শরণাপন্ন হওয়া।' সেজগিনের জন্য, ইসলামি বিজ্ঞানের ইতিহাসকে একত্রিত করার এই আজীবন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল একটি আকস্মিক সাক্ষাতের মাধ্যমে।

তুরস্ক থেকে বিদায়

১৯৪৩ সালে, আরবি সাহিত্যের একজন জার্মান অধ্যাপক হেলমুট রিটার ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে একটি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ১৯ বছর বয়সী সেজগিন, যিনি গণিতবিদ হওয়ার আশায় তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের নিজ শহর বিতলিস থেকে এই শহরে এসেছিলেন। রিটারের বক্তৃতা শোনার পর, সেজগিন তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

সেজগিন ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন, যার ঠিক এক বছর আগেই অটোমানদের (উসমানীয়দের) কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ইস্তাম্বুল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

'১৯৮০-এর দশক থেকে সেজগিনকে চেনা মুসা সেরদার চেলেবি বলেন, 'রিটারের সাথে দেখা হওয়াটা ছিল তাঁর জন্য জীবন বদলে দেওয়ার মতো একটি অভিজ্ঞতা। রিটার ছিলেন অত্যন্ত কঠোর এবং উচ্চচাহিদাপূর্ণ শিক্ষক। তিনি সেজগিনকে মুহাম্মদ ইবনে জারির আল-তাবারী এবং আল-গাজালির রচনাবলি অধ্যয়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি তাঁর এই তরুণ শিষ্যকে দিনে ১৫ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পড়াশোনা করাতেন।'

রিটার বহু বছর ধরে ইস্তাম্বুলে বসবাস করছিলেন। ইস্তাম্বুলের প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোতে এমন অসংখ্য পাণ্ডুলিপির অমূল্য ভাণ্ডার ছিল যা সঠিকভাবে অধ্যয়ন করা হয়নি। তিনি ছিলেন সেই অল্প কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের একজন যারা এই মতবাদে বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের ইতিহাসে তাঁদের প্রাপ্য স্থান দেওয়া হয়নি। এই চিন্তাভাবনা সেজগিনের ওপর এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যিনি পরবর্তীতে জার্মান ওরিয়েন্টালিস্ট (প্রাচ্যবিদ) ঐতিহ্যের এক আজীবন গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন, যা গভীর গবেষণাকে উৎসাহিত করত।

তাঁর কন্যা হিলাল সেজগিন নিজে একজন সাংবাদিক এবং সুপরিচিত লেখিকা ছিলেন। তিনি টিআরটি ওয়ার্ল্ড-কে বলেন, 'এটি তাঁর কাছে ছিল এক মস্ত বড় ধাঁধার মতো। আপনি জানেন তো, ঠিক একজন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো, যিনি নতুন কোনো কিছুর সন্ধান পেয়ে দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং এর সবকিছুই খুঁজে বের করতে চান।'

১৯৬০ সালের ২৭ মে, যখন তুর্কি সামরিক বাহিনী ডেমোক্রেটিক পার্টির সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তখন সেজগিনের কর্মজীবন প্রায় থমকে গিয়েছিল। রাজনৈতিক

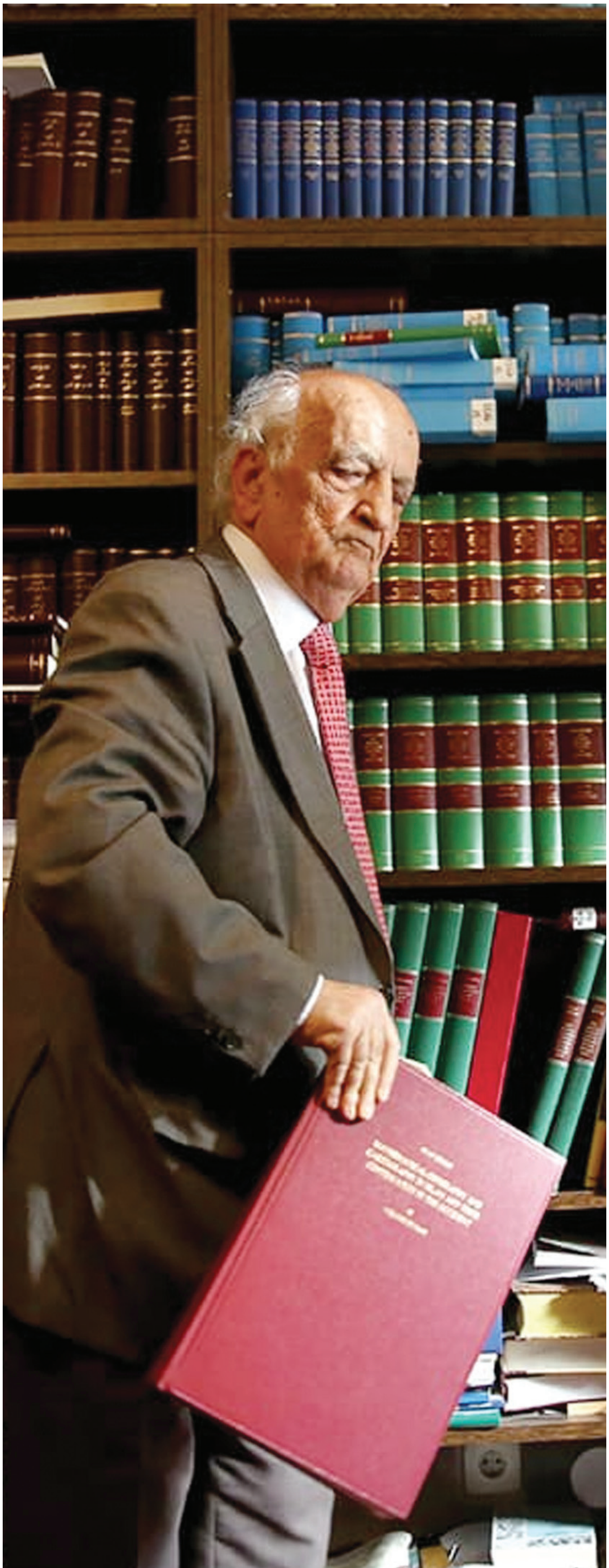

দলগুলোর সাথে সামান্যতম যোগাযোগের কারণেও রাতারাতি সরকারি কর্মকর্তা, চিকিৎসক এবং শিক্ষকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। রাজনৈতিক দলের সাথে তাঁর ভাইয়ের সম্পৃক্ততা থাকার কারণে সেজগিনও তাঁর চাকরি হারান। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে নিজের দেশের প্রতি মোহগ্রস্ত ও হতাশ করে তুলেছিল। পরবর্তীতে তিনি প্রায়শই মন্তব্য করতেন যে, তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া অন্যতম সৌভাগ্যের বিষয়টি ছিল 'আমার এই বহিষ্কার'। এরপর তিনি তাঁর মেন্টর (শিক্ষাগুরু) রিটারের পথ অনুসরণ করে জার্মানিতে চলে যান এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

১৯৭০-এর দশকের মধ্যে সেজগিন তাঁর কর্মক্ষেত্রে একজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হতেন এবং তাঁর বিভিন্ন আবিষ্কার ও গবেষণামূলক কাজ নিয়মিতভাবে নামী জার্নালগুলোতে প্রকাশিত হতো।

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক জেরাল্ড জে. টুমার ১৯৮০-এর দশকে লিখেছিলেন : 'গত ২০ বছরে আরবি অধ্যয়নের সমস্ত ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির উপাদান সম্পর্কে আমাদের তথ্যের যে বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে, তা মূলত ফুয়াত সেজগিনের কাজের কারণেই সম্ভব হয়েছে।'

কোন রেনেসাঁ?

সেজগিন এটি উপলব্ধি করতে বেশি সময় নেননি যে, অধিকাংশ ইউরোপীয় এবং আমেরিকান পণ্ডিত বিশ্বজুড়ে ইসলামি-আরবি বিজ্ঞানের অবদানকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছেন। তাঁদের মতে, পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে পুরো পৃথিবী সাহিত্য ও জ্ঞানগত দিক থেকে এক ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল।

৭ম শতাব্দীতে ইসলামের বিস্তারের সাথে সাথে বাগদাদ, তেহরান এবং অন্যান্য স্থানে গবেষণাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। মুসলিমরা মানবজাতির অগ্রগতির জন্য ক্রমাগত অধ্যয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও দর্শনের উদ্ভাবন করে যাচ্ছিলেন।

অধ্যাপক পিটার স্টার বলেন, 'তিনি (সেজগিন) প্রায়শই বলতেন যে, রেনেসাঁ বলতে আসলে কিছুই নেই। রেনেসাঁ শব্দটির অর্থ হলো পুনর্জন্ম, যা দিয়ে বোঝানো হয় যে ইউরোপীয়রা প্রাচীন গ্রিকদের বিজ্ঞানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিজ্ঞান তো কখনো মরেই যায়নি। আরবরা গ্রিক বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনগুলোকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে আরও উন্নত সংস্করণ তৈরি করেছিল এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করেছিল।'

দশম শতাব্দীর একটি অ্যাস্ট্রোলেবের (জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীন যন্ত্র) অবিকল প্রতিরূপ, যা তৈরিতে সেজগিন সাহায্য করেছিলেন, সেটি 'ইস্তাম্বুল মিউজিয়াম অব হিস্ট্রি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন ইসলাম'-এ প্রদর্শিত ডজন ডজন যন্ত্রপাতির মধ্যে অন্যতম।

'সেজগিনের কাজের একটি বড় অংশ মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম সমৃদ্ধশালী একটি যুগের ওপর আলোকপাত করেছে। অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় রাজবংশের আল-মামুন খলিফা হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে তাঁর রাজধানী বাগদাদ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। এটি একটি অনুবাদ আন্দোলনেরও সূচনা করেছিল, যখন প্লেটো, অ্যারিস্টটল, টলেমি, ইউক্লিড এবং অন্যান্যদের লেখা গ্রিক বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হয়।

মুসলিম পণ্ডিতেরা প্রাচীন চিন্তাবিদদের অর্জিত জ্ঞানকে ক্রমান্বয়ে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের ওপর এক চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। আলকেমিস্ট (প্রাচীন রসায়নবিদ) জাবির ইবনে হাইয়ান আমাদের শব্দভাণ্ডারে 'অ্যালকালি' (Alkali - ক্ষার) শব্দটির প্রবর্তন করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খুয়ারিজমি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাব আল-জাবর (Kitab Al-Jebr) রচনা করেন, যার মাধ্যমে 'অ্যালজেব্রা' (Algebra - বীজগণিত) শব্দটি চিরতরে তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সেই যুগে আরব অভিযাত্রীদের সমুদ্রে পাড়ি দিতে, দূরত্ব পরিমাপ করতে, আফ্রিকা ও এশিয়ার নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে এবং ভূপ্রকৃতির মানচিত্র তৈরি করতেও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখানেও, তাঁদের মুসলিম পূর্বসূরিদের পরিবর্তে মানচিত্রাঙ্কনের (Cartographic) বেশিরভাগ কাজের কৃতিত্ব ইউরোপীয়দের দেওয়া হয়।

খলিফা আল-মামুনের নির্দেশে তৈরি করা মানচিত্রটির বিভিন্ন অংশ একত্র করে তা পুনর্গঠন করতে সেজগিনকে প্রচুর শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হয়েছিল।

১৯৮০-এর দশকের শুরুতে সেজগিন একটি মানচিত্রের অনুলিপি খুঁজে পান, যা খলিফা আল-মামুন তাঁর ভূগোলবিদদের দিয়ে আঁকিয়েছিলেন। পৃথিবীর অনেক উন্নত ও নিখুঁত আকৃতি ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি, এই মানচিত্রটি বহু শতাব্দী আগে টলেমির করা একটি ভুলকে সংশোধন করেছিল : এটি সঠিকভাবে দেখিয়েছিল যে ভারত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর কেবল কোনো স্থলবেষ্টিত অভ্যন্তরীণ সাগর (Inland seas) নয়।

ফুয়াত সেজগিন ফাউন্ডেশনের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. ডেটলেভ কুইন্টার্ন বলেন, 'সেজগিনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই যে, তিনি ভূগোল এবং মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যায় মুসলিমদের অবদানকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি মূলত রেনেসাঁ মডেলের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, যা মুসলিমদের ৮০০ বছরের অবদানকে একপাশে সরিয়ে রেখেছিল বা প্রান্তিক করে দিয়েছিল।'

আরেকটি বিষয় যা সেজগিনকে বহু বছর ধরে ব্যস্ত রেখেছিল, তা হলো মুসলিমদের বিভিন্ন আবিষ্কারের অবিকল প্রতিরূপ বা মডেল তৈরি করার প্রচেষ্টা। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বছরের পর বছর ধরে অ্যাস্ট্রোলেব, পানি উত্তোলন পাম্প পদ্ধতি এবং একদা মুসলিম প্রকৌশলী ও সার্জনদের (শল্যচিকিৎসক) ব্যবহৃত গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির নকশা ও নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এই যন্ত্রপাতিগুলো এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জাদুঘরে প্রদর্শিত রয়েছে। এই কাজের একটি বড় অংশ তদারকি করেছিলেন আয়মান নাফাই নামের একজন মিশরীয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (পুরকৌশলী), যিনি ১৯৯১ সালে সেজগিনের জন্য এই যন্ত্রগুলো তৈরি করা শুরু করেছিলেন।

'তিনি কী চান সে বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং সুচারু ছিলেন। আমরা কাঠ, রুপা, সোনা এবং তামা–সবকিছু ব্যবহার করে যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলাম। আর আমরা সেগুলোর অবিকল প্রতিরূপ বা রেপ্লিকা তৈরিতে সফল হয়েছিলাম।' তবে খলিফা আল-মামুনের মানচিত্রটিকে একটি গোলকের মতো গোলাকার রূপ দেওয়াটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

নাফাই বলেন, 'এটিই হলো ইস্তাম্বুলের জাদুঘরের প্রবেশদ্বারে রাখা সেই গ্লোব বা গোলকটি। এটি পুরোপুরি তামার তৈরি এবং হাতে গড়া। এর কাঠামোটি তৈরি করতে আমাদের ছয় মাস সময় লেগেছিল এবং ত্রিমাত্রিক (3D) মানচিত্রটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে আরও বেশি সময় লেগেছিল।'

এখন যা তাঁকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় তা হলো, মুসলিমদের আবিষ্কারগুলোর প্রতি মানুষের এখন আর তেমন একটা আগ্রহ নেই। 'সেজগিনের বিদায়ের সাথে সাথে আমাদের ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়তো চিরতরে শেষ হয়ে যেতে পারে; তাঁর পরে এই ধরনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো আর কেউই নেই।'

তাঁর অনেক সহকর্মী ও বন্ধুদের মতে, সেজগিন তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের বেশিরভাগ সময় প্রতিদিন ১৫ ঘণ্টা করে কাজ করেছিলেন। বহু বছর ধরে, এবং কিছুটা আজ পর্যন্ত, সেজগিন মূলত একাডেমিক (শিক্ষায়তনিক) মহলেই বেশি পরিচিত ছিলেন। এর প্রধান কারণ হলো তাঁর বেশিরভাগ বই এবং গবেষণাপত্র কেবল জার্মান ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলোর কোনোটিই ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়নি বললেই চলে। ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং ইস্তাম্বুলের আরবি-ইসলামি বিজ্ঞান ইতিহাসের জাদুঘরে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতিগুলোর পাঁচ খণ্ডের ক্যাটালগটি (তালিকা) একটি ব্যতিক্রমী বা দুর্লভ কাজ। ২০০৮ সালে, প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞান ইতিহাসবিদ অধ্যাপক শ্রীরামুল রাজেশ্বর শর্মা এবং তাঁর স্ত্রী ড. রেনাটে শর্মা সেজগিনের এই অনূদিত ক্যাটালগটি প্রকাশ করেন।

শ্রীরামুল একবার টিআরটি ওয়ার্ল্ড-কে বলেছিলেন, 'তাঁর বইগুলো খুব বেশি পরিচিত নয় কারণ তিনি মাত্র কিছু অনুলিপি প্রকাশ করেছিলেন, বড়জোর কয়েক শত। তাছাড়া, তাঁর বইগুলোর বেশিরভাগই জার্মান ভাষায় লেখা। তবে যাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা সবাই তাঁকে চিনবেন।' ১৯৯৬ সালে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল, যখন শ্রীরামুল সেজগিনের তৈরি করা যন্ত্রপাতির অবিকল প্রতিরূপ বা রেপ্লিকাগুলোর সন্ধান পেয়েছিলেন।

তুরস্কে প্রত্যাবর্তন

সেজগিন পরিবার প্রায় প্রতি বছরই তুরস্ক সফর করতেন। তাঁর স্ত্রী উরসুলাও ছিলেন একজন সহকর্মী ইতিহাসবিদ। যদিও তিনি তাঁর পেশাগত জীবনের বেশিরভাগ সময় জার্মানিতে কাটিয়েছিলেন, তবুও তাঁর প্রবন্ধ এবং বইগুলো তুর্কি ভাষায় অনুবাদ হতে শুরু করার পর নিজ দেশে সেজগিনের খ্যাতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, ইস্তাম্বুলে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য তুর্কি কর্মকর্তারা তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন।

এর পর তুরস্কে সেজগিন যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, তা একজন শিক্ষাবিদের জন্য ছিল নজিরবিহীন। সরকার ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত গুলহানে পার্কের (Gülhane Park) চত্বরে একটি জাদুঘর এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জায়গা বরাদ্দ করে।

সেজগিন হাজার হাজার বইয়ের একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন, যার মধ্যে কিছু ছিল তাঁর নিজের খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ পাণ্ডুলিপি। আর যখন তিনি এই ব্যক্তিগত সংগ্রহটি ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেন, তখন ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। এমনকি কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর নিজস্ব অফিসে যাওয়ার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা জার্মান ও ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের প্রতি সেজগিনের শ্রদ্ধাবোধে কোনো প্রভাব ফেলেনি, যা 'ইস্তাম্বুল মিউজিয়াম অব দ্য হিস্ট্রি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন ইসলাম'-এ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। জাদুঘরের প্রবেশদ্বারটি শুরু হয়েছে জোহান উলফগ্যাং গোয়েথির একটি দেয়ালচিত্র (ম্যুরাল) দিয়ে, যার পর রয়েছে জোসেফ আর্নেস্ট রেনান এবং এডুয়ার্ড সাচাউয়ের মতো ব্যক্তিত্বদের প্রতিকৃতি।

২০১৮ সালের জুনে ৯২ বছর বয়সে সেজগিন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে তোপকাপি প্রাসাদের (Topkapi Palace) প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়, যা তুর্কি সরকার কর্তৃক তাঁকে দেওয়া একটি বিশেষ সম্মান ও অধিকার ছিল। প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগানসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা সেজগিনের জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন। ■

নাকবা দিবস, জায়নবাদী রাষ্ট্রের অবস্থা এবং ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার

সাবির আবু মারইয়াম, পিএইচডি
সাধারণ সম্পাদক, প্যালেস্টাইন ফাউন্ডেশন
পাকিস্তান

প্রতি মে মাসে নাকবা (বিপর্যয়ের দিন)-এর বার্ষিকী বিশ্বজুড়ে ন্যায়বিচারপ্রিয় মানুষের মনে একটি পুরোনো ক্ষত আবারও জেগে ওঠে। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে, ফিলিস্তিনের ভূমিতে একটি অবৈধ জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শত শত গ্রাম ধ্বংস করা হয়, লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে তাদের ঘরবাড়ি, কৃষিজমি এবং শহর থেকে উচ্ছেদ করা হয়, এবং একটি সম্পূর্ণ জাতিকে নির্বাসন ও রাষ্ট্রহীনতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনিদের জন্য নাকবা কোনো সমাপ্ত ঐতিহাসিক অধ্যায় নয়, বরং এটি চলমান এক অবিচার।

ঐতিহাসিক বিবরণে বলা হয় যে, ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ চলাকালে জায়নবাদী বাহিনী হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছিল, পানির সরবরাহে বিষ মেশানোর ঘটনা এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের রিপোর্ট পাওয়া যায়, যেখানে মানুষ বা গবাদি পশু কেউই রেহাই পায়নি। বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, প্রায় ৭,৫০,০০০ থেকে

১৫,০০,০০০ ফিলিস্তিনিকে তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়, যা পরবর্তীতে "নাকবা"নামে পরিচিতি পায়।

ইসরাইলের সৃষ্টি কেবল একটি স্থানীয় সংঘাত ছিল না, বরং এটি ছিল একটি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি শুরু হয় বেলফোর ঘোষণা-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায়, জাতিসংঘের বিভাজন প্রস্তাব ১৮১-এর মাধ্যমে অগ্রসর হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক শক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। শুরু থেকেই এই নতুন রাষ্ট্রটি পশ্চিমা বিশ্বের অসাধারণ সমর্থন লাভ করেছিল, যা পশ্চিমা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এর বিশেষ অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে।

এই ব্যতিক্রমী অবস্থান পশ্চিমা সরকারগুলোকে ইসরাইলকে জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা করার সুযোগ দিয়েছে। গবেষকদের মতে, পশ্চিমা শক্তিগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ইউরোপে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত ছিল, কারণ তারা আশঙ্কা করেছিল যে এটি তাদের নিজস্ব সমাজকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। এর পরিবর্তে তারা ফিলিস্তিনে এর প্রতিষ্ঠাকে সহজতর করে, যার ফলে অঞ্চলটির শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং একই সঙ্গে ইসরাইলকে এমন সব বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় যা অন্যদের জন্য অস্বীকৃত।

ইসরাইল এখনও একমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত হয়, যাকে দখলদার এবং অবৈধ উভয়ই মনে করা হয়; যেখানে আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘের প্রস্তাবসমূহ এবং মানবাধিকার নীতিগুলো নিয়মিতভাবে উপেক্ষা করা হয়। যদিও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবগুলো আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়, পশ্চিমা শক্তিগুলো ইসরাইল প্রতিষ্ঠাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য বেলফোর ঘোষণা এবং প্রস্তাব ১৮১-কে সহজেই ব্যবহার করেছে। দশকের পর দশক ধরে চলমান দখলদারি, বসতি সম্প্রসারণ, জাতিগত বৈষম্য এবং সমষ্টিগত শাস্তি সাধারণত কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ হতো–তবুও ইসরাইলের ক্ষেত্রে ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়।

ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর চেয়ে স্পষ্ট আর কিছু নেই। ইসরাইল কেবল একটি মিত্রের চেয়েও অনেক বেশি; এটি মার্কিন নীতি-নির্ধারণে একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থান দখল করে আছে। ইসরাইল-পন্থী পদক্ষেপগুলো সহজেই কংগ্রেসে পাস হয়, অবিরতভাবে বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা প্রবাহিত হয়, এবং উভয় দলের প্রেসিডেন্টরাই ইসরাইলের নিরাপত্তাকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

মার্কিন আইন ইসরাইলের "কোয়ালিটেটিভ মিলিটারি এজ" (QME) বা গুণগত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখাকে বাধ্যতামূলক করেছে। ইসরাইল নির্দিষ্ট, দীর্ঘমেয়াদি এবং শর্তহীন সামরিক সহায়তা পেয়ে থাকে, যা অন্য কোনো দেশের জন্য উপলব্ধ নয়। সংবেদনশীল যৌথ প্রতিরক্ষা প্রকল্পে, যার মধ্যে এফ-৩৫ প্রযুক্তির উন্নত উপাদানও অন্তর্ভুক্ত, প্রবেশাধিকার পাওয়া প্রথম ন্যাটোভুক্ত নয় এমন দেশ ছিল ইসরাইল। সাইবার ও গোয়েন্দা ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে প্রায় সমমর্যাদাসম্পন্ন অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM)-এ ইসরাইলের অন্তর্ভুক্তি, ইসরাইলের ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বমজুত অস্ত্রভাণ্ডার (WRSA-I), এবং যুক্তরাষ্ট্রের মূল কৌশলগত নথি (NSS, NDS)-তে ইসরাইলের নিরাপত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা–এসবই এক অতুলনীয় সম্পর্ককে তুলে ধরে।

কংগ্রেসে অন্য কোনো দেশ এমন তুলনাহীন দ্বিদলীয় সমর্থন, কূটনৈতিক সুরক্ষা বা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বারবার ভেটো সুবিধা পায় না। ইসরাইল কেবল একটি রাষ্ট্র হিসেবেই কাজ করে না, বরং এটি পশ্চিম এশিয়ায় পশ্চিমা শক্তির একটি সামরিক ও রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এই ব্যতিক্রমী অবস্থানের মূল্য পরিশোধ করছে ফিলিস্তিনি জনগণ: অবরুদ্ধ গাজার শিশুরা, পশ্চিম তীরের খণ্ডিত শহরগুলো, জেরুজালেমের বিতর্কিত পবিত্র স্থানসমূহ, শরণার্থী শিবিরে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম, এবং নির্বাসনে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাদের ভূমি দখল করা হয়েছে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, এবং তাদের পরিচয়কে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে–তবুও তাদের মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ও সম্পর্ক অটুট রয়ে গেছে।

ফিলিস্তিনি সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রত্যাবর্তনের অধিকার। জাতিসংঘের প্রস্তাব ১৯৪ নিশ্চিত করে যে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের তাদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ইসরাইলের এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি মূল সমস্যাটিকেই প্রকাশ করে: ব্যাপকভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটলে দখলদারিত্বের জনসংখ্যাগত ও বর্ণনাভিত্তিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

ফিলিস্তিনিরা ১৫ মে-কে একই সঙ্গে নাকবা দিবস এবং প্রত্যাবর্তনের দিন হিসেবে পালন করে। ফিলিস্তিনের প্রশ্নটি কেবল কোনো সীমান্ত বিরোধ নয়, বরং নিজ মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য বঞ্চিত একটি জাতির সম্মিলিত দাবি। দশকের পর দশক দখলদারিত্ব, অবরোধ, দমন-পীড়ন এবং অনেকের ভাষায় গণহত্যার মুখোমুখি হওয়ার পরও ফিলিস্তিনিরা তাদের অধিকার বা ঐতিহাসিক স্মৃতিকে ত্যাগ করেনি।

বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্ম ক্রমশ পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাবশালী বয়ানকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। গাজা ও লেবাননের সংঘাত ইসরাইলের প্রচারিত ভাবমূর্তি এবং দখলদারিত্ব ও সহিংসতার বাস্তবতার মধ্যকার ব্যবধানকে উন্মোচিত করেছে, পাশাপাশি মানবাধিকারের প্রশ্নে পশ্চিমা বিশ্বের দ্বিমুখী মানদণ্ডকেও সামনে এনেছে।

অতএব, নাকবা দিবস কেবল শোকের দিনই নয়, বরং অবিচল অঙ্গীকারেরও দিন: প্রত্যাবর্তনের অধিকারের প্রতি অঙ্গীকার, জেরুজালেমের মুক্তির প্রতি অঙ্গীকার, এবং এই বিশ্বাসের প্রতি অঙ্গীকার যে কোনো নিপীড়নই চিরস্থায়ী নয়।

প্রতি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের আহ্বান আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে: প্রত্যাবর্তন সন্নিকটে, এবং ফিলিস্তিন মুক্ত হবেই। ■

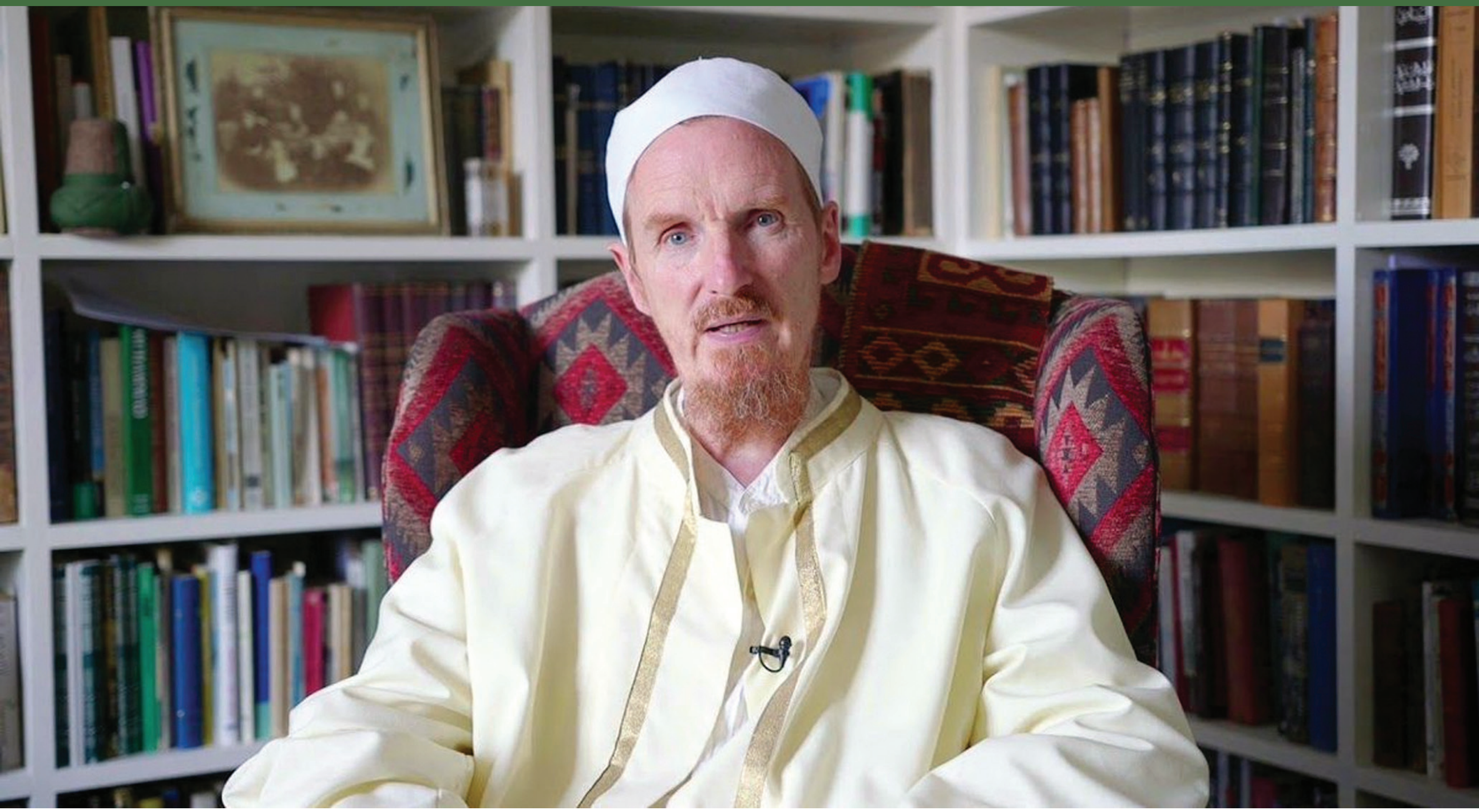

টিমোথি উইন্টার
ইসলামী ঐতিহ্য ও আধুনিক ব্রিটেনের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী পণ্ডিত

প্রকৌশলী মোহসিউ মিনহাজ নিলয়
শিক্ষক, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
ঢাকা

শায়খ আবদাল হাকিম মুরাদ, যিনি আগে টিমোথি জন উইন্টার নামে পরিচিত ছিলেন, ব্রিটেনের একজন সম্মানিত মুসলিম বুদ্ধিজীবী। শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম স্কলারশিপ বা পাণ্ডিত্যকে এগিয়ে নেওয়া, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা বাড়ানো এবং পাশ্চাত্যে ইসলামী আধ্যাত্মিকতা ও ঐতিহ্যের চর্চাকে নতুন রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা (Islamic Studies) বিভাগের একজন অধ্যাপক হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করছেন। তিনি উলফসন কলেজের একজন ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং কেমব্রিজ মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রারম্ভিক জীবন ও শিক্ষা

উইন্টার ১৯৬০ সালে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়েস্টমিনস্টার স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে কেমব্রিজের পেমব্রোক কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি আরবি ভাষায় 'ডাবল ফার্স্ট' (সর্বোচ্চ সম্মান) পেয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। তার শুরুর দিকের

এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ভাষা, সাহিত্য এবং ধর্মীয় পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। তবে তার জানার আগ্রহ শীঘ্রই তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও বাইরের দুনিয়ায় নিয়ে যায়, যা তার পরবর্তী জীবন ও চিন্তাভাবনাকে নতুন রূপ দিতে সাহায্য করেছিল।

কেমব্রিজের পড়াশোনা শেষ করে উইন্টার মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে ডুবে যান। তার এই সফর কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সৌদি আরব এবং ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যা তাকে ঐতিহ্যবাহী আলেম ও পণ্ডিতদের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দেয়। পরবর্তীতে, তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুর্কি ও ফার্সি ভাষা শেখেন এবং ইসলামী ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব (Theology) নিয়ে তার গবেষণা আরও গভীর করেন। পাশ্চাত্য বা পশ্চিমা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মানুবর্তিতা এবং প্রাচীন বা ক্লাসিক্যাল পাণ্ডিত্যের এই মেলবন্ধন তাকে একটি অনন্য কণ্ঠস্বর ও পরিচিতি এনে দিয়েছিল।

তিনি বেশ কয়েকটি ভাষায় কথা বলতে পারেন এবং প্রাচীন বা ক্লাসিক্যাল আরবি গ্রন্থগুলো নিয়ে কাজ করেন। তিনি ইংরেজিভাষী মুসলিমদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা এবং ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন পাণ্ডিত্যের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত কাজ

উইন্টার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা (Islamic Studies) বিষয়ের 'শায়খ জায়েদ লেকচারার' হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি উলফসন কলেজের ডিরেক্টর অব স্টাডিজ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া, কেমব্রিজ মুসলিম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তার নাম রয়েছে। এই দায়িত্বগুলো একজন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক হিসেবে তার অবদানকে ফুটিয়ে তোলে।

তার প্রকাশিত বই এবং অনুবাদগুলো পাঠকদের ইসলামী চিন্তাভাবনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তিনি ধর্মতত্ত্বের ওপর বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বই সম্পাদনা ও রচনা করেছেন এবং ইমাম আল-গাজালির বিখ্যাত গ্রন্থ 'এহয়াহু উলুমিদ্দীন' অনুবাদ করেছেন। তিনি প্রায়শই ইসলামের মূলধারা, আধ্যাত্মিকতা, মুসলিম-খ্রিস্টান সম্পর্ক, আধুনিকতা এবং ইউরোপে মুসলিমরা যেসব চ্যালেঞ্জ বা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে–সেসব বিষয় নিয়ে লিখে থাকেন।

উইন্টার কেমব্রিজের 'সুন্নাহ প্রজেক্ট'-এর সাথেও কাজ করেছেন, যেখানে তিনি সুন্নি মতাদর্শের প্রধান প্রধান হাদিস গ্রন্থগুলোর আরবি সংস্করণ তৈরিতে সহায়তা করেছেন। তিনি ধর্ম, নৈতিকতা এবং সমাজ নিয়ে বিভিন্ন জনসমক্ষে বা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে বিবিসি রেডিও ফোর-এর 'থট ফর দ্য ডে' অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি এবং বিদেশে দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য বা লেকচার অন্যতম।

ধর্মান্তর এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি

উইন্টার ১৯৭৯ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং 'আবদাল হাকিম মুরাদ' নাম ধারণ করেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর এই পথচলাকে হঠাৎ করে নিজের অতীত বা শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হিসেবে দেখেননি, বরং বস্তুবাদ বা জাগতিক মোহের বাইরে গিয়ে জীবনের আরও গভীর অর্থ খোঁজার একটি প্রয়াস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তরুণ বয়সেই তিনি ধর্মীয় বিভিন্ন প্রশ্ন, ইসলামের সৌন্দর্য, নিয়মানুবর্তিতা এবং ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের ভেতরে পরিবর্তন আনার ক্ষমতার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তার পরবর্তী সময়ের পাণ্ডিত্য বা গবেষণায় সেই সত্য অনুসন্ধানের প্রতিফলন দেখা যায়। ইসলামকে কেবল রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, উইন্টার ইবাদত, উন্নত চরিত্র, সৌন্দর্য, জ্ঞানগত নম্রতা এবং ঐতিহ্যের সাথে গভীর সংযোগের ওপর জোর দিয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। এটি তাকে মুসলিমদের মাঝে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করেছে, যার লক্ষ্য হলো আধুনিক পশ্চিমা সমাজে আত্মবিশ্বাসের সাথে বসবাস করার পাশাপাশি ইসলামের প্রাচীন ও মূল শিক্ষাগুলোকে ধারণ করা।

কেমব্রিজ মুসলিম কলেজ

২০০৯ সালে উইন্টার 'কেমব্রিজ মুসলিম কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন এক নতুন প্রজন্মের মুসলিম পণ্ডিত, শিক্ষক এবং সমাজসেবকদের তৈরি করা–যারা ইসলামী ঐতিহ্য এবং আধুনিক ব্রিটেনের সামাজিক বাস্তবতা- এ, দুই বিষয়ই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এই কলেজের প্রোগ্রাম বা কোর্সগুলোর লক্ষ্য হলো–ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক দায়িত্ব এবং নাগরিক প্রশিক্ষণের একটি চমৎকার মেলবন্ধন ঘটানো।

এই কলেজটি যুক্তরাজ্যের অন্যতম প্রধান ইসলামী শিক্ষা ও

গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি হিসেবে উইন্টার শিক্ষাব্যবস্থাকেই তাঁর মূল লক্ষ্যের কেন্দ্রে রেখেছেন। তিনি ইমামদের প্রশিক্ষণ, ব্রিটিশ মুসলিমদের আত্মপরিচয় এবং আধুনিক সমাজে ইসলামী পাণ্ডিত্যের স্থান কেমন হওয়া উচিত–এই বিষয়গুলোর আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

কেমব্রিজ কেন্দ্রীয় মসজিদ

উইন্টারের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও বড় সামাজিক অর্জনগুলোর একটি হলো কেমব্রিজ সেন্ট্রাল মসজিদে তাঁর ভূমিকা। ২০১৯ সালে চালু হওয়া এই মসজিদটিকে ব্যাপকভাবে ইউরোপের প্রথম 'ইকো-মসজিদ' বা পরিবেশবান্ধব মসজিদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এখানে একসঙ্গে প্রায় ১,০০০ জন মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন । এটিকে একবিংশ শতাব্দীর একটি 'ব্রিটিশ মসজিদ' হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে ইসলামের জ্যামিতিক নকশা ও আধ্যাত্মিকতার সাথে ইংল্যান্ডের নিজস্ব উপাদান, বাগান এবং পরিবেশগত সচেতনতার এক চমৎকার মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

মসজিদটির পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক আলো, কম শক্তির এলইডি লাইট, সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল (ফটোভোলটাইক সেল), শক্তিশালী তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক বাতাস চলাচলের সুবিধা, হিট-পাম্প প্রযুক্তি, বৃষ্টি ও ব্যবহৃত পানি পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা, সাইকেল রাখার সুবিধা এবং বিশাল সবুজ এলাকা। কার্বন নিঃসরণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা এই ডিজাইনটি কেবল কেমব্রিজের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যই একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেনি, বরং ধর্ম এবং পরিবেশ রক্ষার পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনাকেও আরও বড় পরিসরে নিয়ে গেছে।

কেমব্রিজ মস্ক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান উইন্টার এই মসজিদটিকে কেবল একটি নামাজের স্থান হিসেবেই নয়, তার চেয়েও বড় কিছু হিসেবে তুলে ধরেছেন। এটি একটি প্রকাশ্য প্রতীক যা দেখায় যে কীভাবে ধর্মীয় স্থাপত্য একই সাথে মুসল্লি, প্রতিবেশী এবং প্রকৃতি–সবার উপকারে আসতে পারে। এর চমৎকার বাগান, ক্যাফে, শিক্ষামূলক আলোচনা এবং সামাজিক কার্যক্রমের কারণে এটি মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্যই একটি দারুণ মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

স্বীকৃতি এবং অক্ষুণ্ণ প্রভাব

মুরাদ তাঁর পাণ্ডিত্য ও সমাজসেবার জন্য সুপরিচিত এবং তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক 'পিলকিংটন টিচিং প্রাইজ' লাভ করেছেন। বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী মুসলিমদের নিয়ে প্রকাশিত বার্ষিক তালিকা 'দ্য মুসলিম ৫০০'-এ তাঁর নাম রয়েছে। ২০২৬ সালের সংস্করণে, 'দ্য মুসলিম ৫০০' ড. মুরাদকে শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতদের অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং সেখানে তাঁর সাম্প্রতিক র্যাংকিং বা অবস্থান দেখানো হয়েছে–২০২৫ সালে ৩৪তম, ২০২৪ সালে ৩৬তম এবং ২০২৩ সালে ৩৫তম, যা তাঁর ব্যাপক প্রভাবেরই প্রমাণ দেয়। তিনি একাধারে একজন প্রাতিষ্ঠানিক

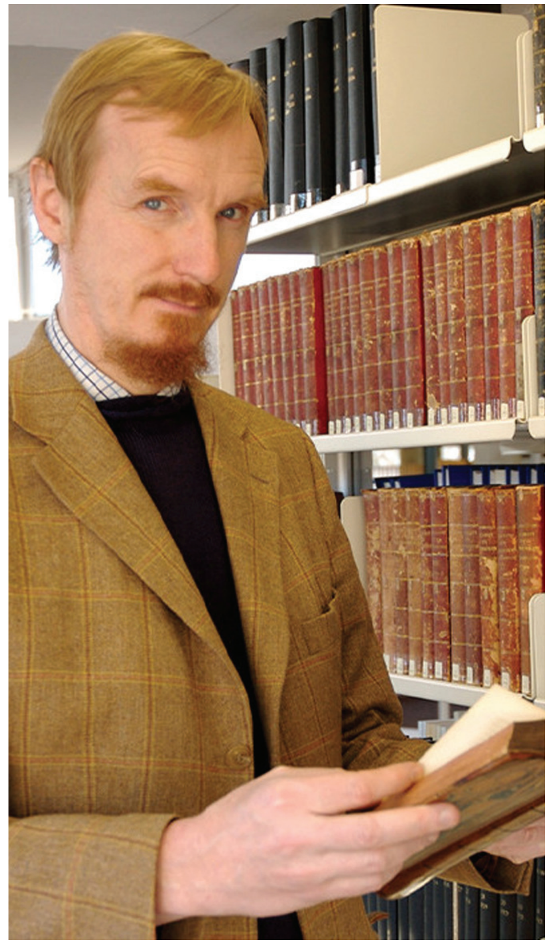

বিশেষজ্ঞ, অনুবাদক, প্রতিষ্ঠাতা, লেকচারার, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির পথপ্রদর্শক এবং ইংরেজিভাষী মুসলিমদের অভিভাবক হিসেবে ধর্মীয় ও শিক্ষাগত জীবনকে নতুন রূপ দিচ্ছেন। তাঁর কাজ মূলত কিছু জরুরি বিষয়ের সমাধান খোঁজে : ধর্মীয় গভীরতা ধরে রাখা, ভবিষ্যতের মুসলিম নেতাদের শিক্ষিত করে তোলা, প্রাতিষ্ঠানিক সততা রক্ষা করা এবং ধর্মকে দয়া, সৌন্দর্য ও দায়িত্বশীলতার একটি উৎস হিসেবে গড়ে তোলা।

টিমোথি উইন্টারের জীবন এমন একজন ব্রিটিশ পণ্ডিতের কাহিনী তুলে ধরে, যিনি প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে জ্ঞানার্জন, শিক্ষাদান ও প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর অবদান কেমব্রিজের ক্লাসরুম থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী পাণ্ডিত্য, প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ এবং একটি পরিবেশবান্ধব মসজিদ নির্মাণ পর্যন্ত বিস্তৃত। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ব্যবহারিক–উভয় দিক থেকেই তাঁর কাজ সত্যিই অনন্য ও অসাধারণ।

ড. মুরাদ এমন কিছু জগতের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেছেন যা প্রায়শই বিভক্ত থাকে : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতা, এবং উপাসনা ও জনসেবা। তিনি ব্রিটেনের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম চিন্তাবিদ হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন। ■

শাহ্ আবদুল হান্নান : বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন প্রবাদপুরুষ

আকবর আলি খান
উপদেষ্টা, প্রাক্তন মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও গ্রন্থকার

শাহ্ আবদুল হান্নান বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ইতিহাসে একজন প্রবাদপুরুষ। তাঁর নাম আমি শুনতে পাই ১৯৭০-এর দশকে কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় ১৯৯১ সালে। শাহ্ আবদুল হান্নানের খ্যাতির দুটি কারণ ছিল। একটি কারণ হলো শুল্ক ও আবগারি ক্যাডারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি একেবারে নিখাদ সৎ অফিসার ছিলেন। বাংলাদেশ শুল্ক ও আবগারি ক্যাডারে ১০ শতাংশ কর্মকর্তাও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। অন্যদিকে এত সৎ অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। কয়েক বছর লড়াই করে তিনি সসম্মানে চাকরি ফেরত পান। তাঁর এ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের প্রশাসনে দুষ্টের পালন করা হয় আর শিষ্টকে করা হয় দমন।

১৯৯১ সালে শাহ্ আবদুল হান্নানের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন বিভাগের সদস্য। আমি তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে যোগ দিয়েছি। অর্থমন্ত্রী মো.

সাইফুর রহমানের কক্ষে তখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন বিভাগের সঙ্গে বৈঠক চলছে। বৈঠকের আগেই অর্থমন্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি যখন গেলাম তখন বৈঠক শুরু হয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী আমাকে বসতে বললেন। অর্থমন্ত্রী খুবই খারাপ মেজাজে ছিলেন। সম্ভবত বিশ্ব ব্যাংকের শর্ত পূরণ না করায় বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকর্তারা তাঁর সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে দুটি খাতে বিশ্ব ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজে সন্তুষ্ট ছিল না। একটি খাত হলো মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনে দেরি করা। দ্বিতীয়টি হলো ব্যাংকিং খাতে সংস্কার না করা।

অর্থমন্ত্রী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান নুরুল হোসেন খানকে কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেন। অথচ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থমন্ত্রীর সহপাঠী ছিলেন। বিপদে পড়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান নুরুল হোসেন খান এবং সদস্য শাহ্ আবদুল হান্নান অর্থমন্ত্রীর কাছে মাফ চেয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর অর্থমন্ত্রী আমার দিকে তাকালেন। তাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে বিএসআরএস বিরাষ্ট্রীয়করণের জন্য দুই সপ্তাহ আগে বলেছি। এখনো এ সম্বন্ধে কোনো অগ্রগতি হয়নি কেন? যদি এক সপ্তাহের মধ্যে এ কাজ না করতে পারো তাহলে আমাকে নতুন অতিরিক্ত সচিব খুঁজতে হবে'। আমি অত্যন্ত বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে অর্থমন্ত্রীকে বললাম, 'এক সপ্তাহের মধ্যে এ কাজ করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এটা কেউ করতে পারবে না। যদি পারেন তাহলে এ রকম অতিরিক্ত সচিব আপনি যোগাড় করে নেন। আমার এখানে কাজ করার দরকার নেই'।

আমার কথা শুনে শাহ্ আবদুল হান্নান আমার হাত ধরে বললেন, 'খান সাহেব, বসদের সঙ্গে এত শক্ত কথা বলতে নেই'। অর্থমন্ত্রী চুপ করে গেলেন এবং বললেন, 'যাও কাজ করো গিয়ে'। মো. সাইফুর রহমানের সঙ্গে আমি প্রায় পাঁচ বছর সরাসরি কাজ করেছি। এই ঘটনার পর তিনি কোনোদিনও আমাকে ধমক দেননি এবং আমার সঙ্গে সবসময় ভালো ব্যবহার করেছেন। যারা মো. সাইফুর রহমানের গালি সহ্য করত তারাই আরও গালি খেত। যারা গালি সহ্য করত না তাদের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হতেন। তাই আর তাকে গালিগালাজ করতেন না। মো. সাইফুর রহমানের বিএসআরএস বিরাষ্ট্রীয়করণ তাঁর মন্ত্রীত্বকালে সম্ভব হয়নি। এমনকি পরবর্তী মন্ত্রীদের সময়ও সম্ভব হয়নি। অতি সম্প্রতি এই ব্যাংককে শিল্প ব্যাংকের সঙ্গে একত্রিত করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি পরে শাহ্ আবদুল হান্নানের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

শাহ্ আবদুল হান্নান তাঁর চাকরি জীবনের প্রায় পুরোটাই কাজ করেছেন আর্থিক খাতে। বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে মহাব্যবসায়ীরা, যাদের হাতিয়ার হলো প্রবঞ্চনা এবং দস্যুতা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তিনি কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এ কাজ বেশিরভাগই তাঁর নিজের হাতে করতে হয়েছে। কারণ তাঁর অধঃস্তন কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ছিল দুর্নীতিবাজ। তাঁর সততা এবং কর্মদক্ষতা বিবেচনা করে সরকার তাঁকে দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ করেন। সেখানে তিনি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। বিশেষভাবে আর্থিক খাতের দুর্নীতিবাজরা তাঁর কর্মকাে- বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁকে বাংলাদেশ ব্যাংকে ডেপুটি গভর্নর পদে নিয়োগ করা হয়। ডেপুটি গভর্নর থাকাকালীন তিনি খেলাপি ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। বিভিন্ন ব্যাংকে ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তিনি কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শাহ্ আবদুল হান্নানের একটি বড়ো অবদান হলো বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংক ব্যবস্থার পুনর্গঠন। ইসলামি ব্যবস্থায় ব্যাংক পরিচালনা করতে হলে প্রচলিত নিয়ম-কানুনের পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। এ-ছাড়া নতুন নিয়ম-কানুনও প্রয়োজন ছিল। তিনি এ কাজটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করেছেন।

সরকার তাঁকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের সচিব পদে নিয়োগ করেন। এ সময়ে আমি অর্থ সচিব হিসেবে তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি। কিছুদিন পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ শূন্য হয়। সরকার তাঁকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। তিনি এই পদে থাকাকালীন সরকারি চাকরিতে তাঁর বয়স শেষ হয়ে যায়। সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তাঁকে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেন। সরকার তাঁকে আরও এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু শাহ্ আবদুল হান্নান নিজেই চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

সরকারের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। প্রথমত, তিনি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ইসলামী ব্যাংক, ইবনে সিনা হাসপাতাল, মানারাত ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অভ ট্রাস্টিজের সভাপতি অথবা সদস্য পদ গ্রহণ করেন। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে এসব দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি এসব দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি বিভিন্ন কাগজে কলাম লেখা শুরু করেন। এই কলামগুলোতে তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ্যভাবে পেশ করেন। তবে এ দুটি কাজই বিতর্কিত ছিল। তিনি ইসলামপন্থি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত হন। এটি নিয়ে তাঁর কোনো দুঃখ ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। নিজের মতে যেমন তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল তেমনি বিরুদ্ধ মতের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

শাহ্ আবদুল হান্নানের মতো সরকারি কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে যত গবেষণা হবে, দেশের জন্য তা হবে কল্যাণকর। আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। ■

মৃত্যুর আগে ড. আকবর আলি খান প্রশাসনে তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী শাহ্ আবদুল হান্নানকে নিয়ে স্মারক গ্রন্থের জন্য এটি লিখেছিলেন

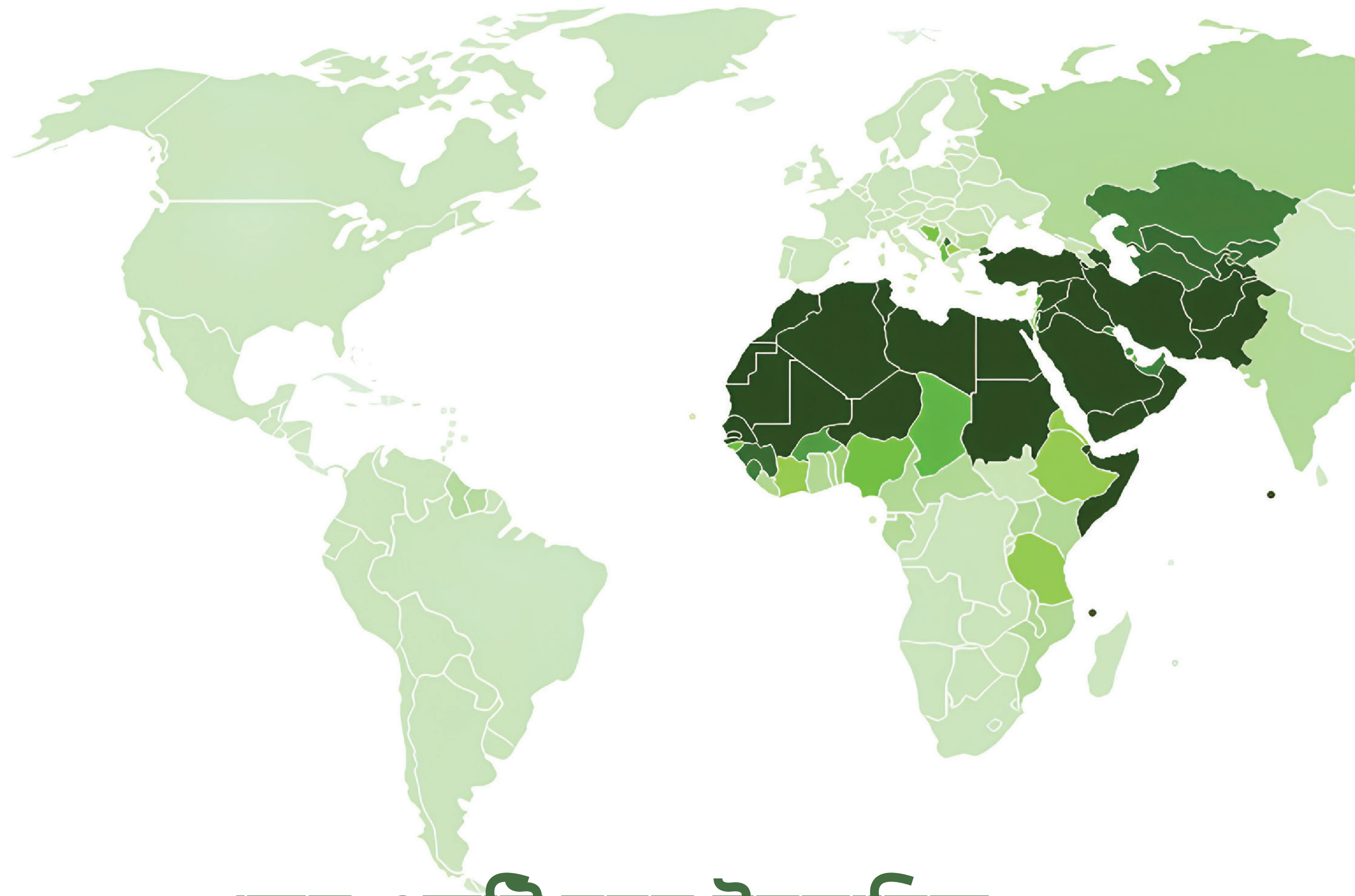

কেন একটি নতুন ইসলামিক ওয়েবসাইট ও ম্যাগাজিন

এসসাম মুহাম্মদ আল-শাহাদাত

প্রথমেই 'ইসলামিক' শব্দটির যথার্থ সংজ্ঞা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ অনেকের কল্পনাই এ নিয়ে লাগামছাড়া হতে পারে। তারা ধরে নিতে পারেন যে, তারা একটি কঠোর, রক্ষণশীল ও বর্জনমূলক ওয়েবসাইটের মুখোমুখি হচ্ছেন–কিংবা 'ইসলাম' ও 'ইসলামিক' শব্দের সাথে জুড়ে দেওয়া অন্য কোনো নেতিবাচক ধারণার সম্মুখীন হচ্ছেন, যা শব্দটির প্রকৃত সৌন্দর্য ও আত্মাকে মানুষের মনে বিকৃত করে তুলেছে।

দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিমা বিশ্বের কথা বিবেচনা করার আগেই, স্বয়ং আরব ও মুসলিম গণমাধ্যমগুলো (সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ধারাবাহিকসহ) মুসলিম মানসে এই নেতিবাচক চিত্রটি গেঁথে দিতে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করছে। জনসাধারণের ভাবনায় 'ইসলামিক' মানেই হয়ে উঠেছে দীর্ঘ দাড়ি ও ক্রুদ্ধ

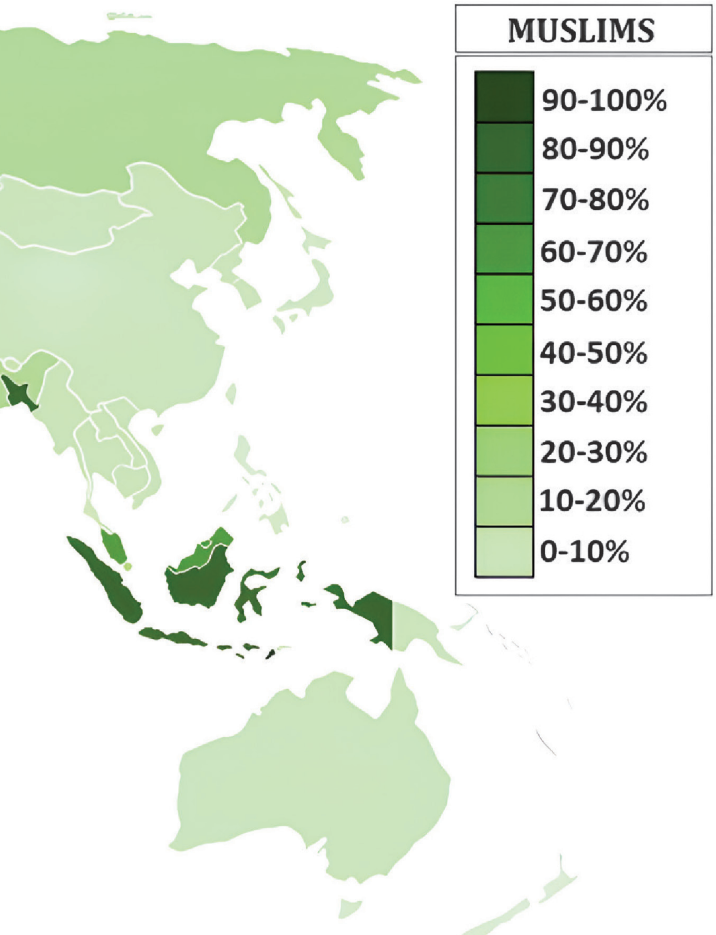

চেহারার এক ব্যক্তি, যে হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে সুন্দরের সবকিছুকে ধ্বংস করতে উদ্যত।

এর একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো ক্ষমতাচ্যুত বাশার আল-আসাদ ও তার পিতার শাসনামলে সিরীয় গণমাধ্যমের প্রোপাগান্ডা। তাদের লক্ষ্য ছিল এই বার্তা দেওয়া যে, সিরীয় 'রাষ্ট্র' আসলে উগ্র 'ইসলামিক সন্ত্রাসীদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অথচ বাস্তব সত্যটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত, যা অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন বা অস্বীকার করে। যদি আমরা বিষয়টি নিছক ভাষাগত দিক থেকেও বিবেচনা করি, তবে ইসলাম শব্দের অর্থই হলো সর্বজনীন আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের চেয়ে উচ্চতর প্রশান্তি আর কী হতে পারে? যেখানে মানুষ তার সমগ্র সত্তাকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করে তাঁর নির্দেশাবলি মেনে চলে। সেই পরম স্রষ্টা-যিনি মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও নাস্তিকসহ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন–তিনিই একমাত্র পথ প্রদর্শক। আর তিনি কিসের দিকে পথ দেখান? সরল ও সঠিক পথের (সিরাতাল মুস্তাকিম) দিকে। এই পথের শেষ গন্তব্য কোথায়? জান্নাত–যা আকাশ ও পৃথিবীর মতোই বিশাল।

একজন মুসলিমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ' (বুখারী ও মুসলিম)। যে ব্যক্তি এর পরিপন্থী কাজ করে, সে নিজেকে মুসলিম দাবি করলেও ইসলামের মূল চেতনা থেকে দূরে। একইভাবে হাদিসে এসেছে, 'যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা; যে ধর্মের মূল কথা হলো–"তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।' সুতরাং, সমাজ ও মানুষকে ঘৃণা করা চরমপন্থীদের কাল্পনিক চিত্রের সাথে প্রকৃত ইসলামের তুলনা কীভাবে সম্ভব? পরিশেষে বলা যায়, গণমাধ্যমে প্রচারিত 'ইসলামপন্থী"-র এই বিকৃত রূপটি কখনোই একজন প্রকৃত মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ এই দুইয়ের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ এবং জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। প্রকৃত মুসলিম সর্বজ্ঞ বিচারকের আরোপিত ঐশ্বরিক মানবিক নীতিমালার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

বিষয়টি দ্বৈত নাগরিকত্ব ধারণকারী একজন ব্যক্তির মতো; যে হয়তো মূলত সিরীয় বা আলজেরীয়, কিন্তু যাতায়াতের সময় ফরাসি বা কানাডীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে। যখন সে সীমান্ত পার হয়, তখন সে একজন ফরাসি বা কানাডীয় নাগরিক হিসেবেই পার হয়, সিরীয় বা আলজেরীয় হিসেবে নয়। একইভাবে, কোনো ব্যক্তি যখন প্রতারণা বা অনৈতিক আচরণ করে, তখন সে তা একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই করে, ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে নয়। ইসলামের নীতি লঙ্ঘন করার মুহূর্তেই তার কাজের ইসলামী বৈধতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়।

'উম্মাহ' প্ল্যাটফর্ম

তবে এটিও সত্য যে, 'উম্মাহ' প্ল্যাটফর্মটি প্রচলিত সংকীর্ণ বা আক্ষরিক অর্থে কেবলই একটি 'ইসলামিক সাইট' নয়, কিংবা এটি কোনো প্রথাগত ধর্মপ্রচার বা একটি সীমাবদ্ধ প্ল্যাটফর্মও নয়। এটি প্রতিষ্ঠার মূল ভাবনাটি এসেছে বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সমসাময়িক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে গভীর আলোচনার একটি উন্মুক্ত ফোরামের প্রয়োজনীয়তা থেকে। এটি এমন একটি বৈশ্বিক আঙিনা, যা মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সংযোগগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করবে।

যদিও এটি প্রাথমিকভাবে মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করে তৈরি, তবে এর মূল বার্তা হলো সার্বিক নৈতিকতার পথে ফিরে আসার এবং মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যমের মানদণ্ডকে উন্নত করার আহ্বান। এর লক্ষ্য হলো চিন্তাশীল আলোচনাকে উৎসাহিত করা এবং পারস্পরিক মর্যাদা, সহাবস্থান ও সভ্যতার অগ্রগতির ওপর

ভিত্তি করে এক নতুন রূপকল্প উপস্থাপন করা। একই সাথে যুক্তিবাদ, প্রশান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতির পরিপন্থী প্রচলিত উগ্র চিন্তাধারাগুলোকে পুনর্বিবেচনা করা।

আজ আমরা স্বীকার করি বা না করি, আমরা এক বহুমাত্রিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি:

ইসলামী গণমাধ্যমের সংকট: যা প্রায়শই যুক্তিহীন আবেগ বা বিভাজনমূলক আলোচনায় রূপ নেয়; জ্ঞানের সংকট: যা বহু মুসলমানকে একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ করে রেখেছে; ধর্মীয় আলোচনার সংকট: যা অনেক সময় স্থবিরতা ও সংকীর্ণ মানসিকতার শিকার হয়; আধুনিক যোগাযোগের সংকট: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যালগরিদমের কারণে তৈরি হওয়া অগভীর ও দ্রুতগতির বিষয়বস্তুর আধিপত্য; ভৌগোলিক ও ভাষাগত বিভাজন: যা ইসলামী বিশ্বের জনগণকে বিশ্বাসে কাছাকাছি রাখলেও বৈশ্বিক যোগাযোগ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় বহু দূরে স্থাপন করেছে।

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য হলো, একজন সাধারণ মুসলিম হয়তো আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির খুঁটিনাটি সম্পর্কে যতটুকু জানেন, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, বসনিয়া বা লাতিন আমেরিকার মুসলিমদের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে তার চেয়ে অনেক কম জানেন। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি নিজস্ব স্থানীয় ভাষার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়, তা বৈশ্বিক রূপ পায় না।

একজন বাংলাদেশী পাঠক সিরিয়া সম্পর্কে কী পড়ছেন? একজন আরব নাগরিক লাতিন আমেরিকার মুসলিমদের সম্পর্কে কতটুকু জানেন? তুর্কিরা এমন কী চমৎকার বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করছেন যা আরব বা অনারবদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না? মালয়েশীয়দের সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো কেন অনূদিত হচ্ছে না?

এখান থেকেই 'আল-উম্মাহ' (The Ummah)-এর ধারণার উৎপত্তি:

'আল-উম্মাহ'-এর মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সেই অমর বাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করা, যেখানে তিনি বলেছেন: 'আমাকে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।'

এখন মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক: ইন্টারনেটে বিদ্যমান অসংখ্য ইসলামী ওয়েবসাইট ও প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে আমাদের এই ওয়েবসাইটটি নতুন কী অবদান রাখবে? আমরা স্পষ্ট করেই বলতে চাই, আমরা পূর্বসূরি সবার কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের পরিপূরক হিসেবেই কাজ করতে

চাই। তবে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় জনমতকে লক্ষ্য করে পরিচালিত এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে আমরাও আমাদের সাধ্যমতো অবদান রাখতে চাই। আমরা এমন একটি জ্ঞান ও গণমাধ্যমের সমন্বয় ঘটাতে চাই, যা ভাষা ও ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের মধ্যে ধারণা, অভিজ্ঞতা ও মেধার আদান-প্রদানের এক নতুন দুয়ার খুলে দেবে।

আরবি প্রবাদে যেমন বলা হয়, 'যত বেশি, তত ভালো।' তবে শুধু সংখ্যার আধিক্যই আমাদের লক্ষ্য নয়। গণমাধ্যম ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল অবদান রাখাই যথেষ্ট নয়; আমাদের এমন ভিন্ন কিছু উপস্থাপন করতে হবে যা পাঠককে চিন্তার খোরাক জোগাবে এবং তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে।

'উম্মাহ' প্ল্যাটফর্মে আমরা এমন বিষয়বস্তু সরবরাহ করার চেষ্টা করব যা অভিনব, বস্তুনিষ্ঠ এবং কল্যাণকর; যা আমাদের জীবন ও চিন্তাভাবনাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। সস্তা চাঞ্চল্য সৃষ্টি, মেরুকরণ বা নেতিবাচক প্রচারণার কোনো স্থান এখানে নেই।

এই স্বাতন্ত্র্য অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো-'উম্মাহ' পত্রিকা এবং এর অনলাইন প্ল্যাটফর্মটি একই সাথে আরবি, ইংরেজি, বাংলা ও তুর্কি-এই চারটি প্রধান ভাষায় প্রকাশিত হবে। যেখানে বিশ্ব মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, গবেষণা ও সমসাময়িক চিন্তাধারার পারস্পরিক অনুবাদের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

আমরা চাই না কোনো জ্ঞান বা অনন্য অভিজ্ঞতা শুধু নির্দিষ্ট ভাষার গণ্ডিতেই আটকে থাকুক। বরং আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলো বাংলা থেকে আরবিতে, ইংরেজি থেকে তুর্কিতে এবং আরবি থেকে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করব, যাতে এর সুফল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই ভাষাগুলো বেছে নেওয়ার অর্থ হলো, আমরা পৃথিবীর এক বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছি, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব আঞ্চলিক সমস্যা থাকলেও, তারা মূল আদর্শিক জায়গায় এক ও অভিন্ন। ফিলিস্তিন ইস্যুর মতো এমন অনেক অভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিষয় রয়েছে, যা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মুসলিমকে সমানভাবে নাড়া দেয়।

তাছাড়া, 'আল-উম্মাহ"-তে যারা লিখবেন, তারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আমেরিকা, মিশর, আলজেরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও পটভূমি থেকে আসা গবেষক ও লেখক। এই প্ল্যাটফর্মটি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক প্রবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটি অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা, গবেষণা, অনুবাদ, বই পর্যালোচনা এবং সহজবোধ্য ভাষায় গভীর জ্ঞান ছড়াতে পারে এমন যেকোনো সৃজনশীল কাজের পথ উন্মুক্ত রাখবে।

পরিশেষে, 'আল-উম্মাহ' ইন্টারনেটে বিদ্যমান হাজারো সাইটের ভিড়ে কেবল আরেকটি সংখ্যার সংযোজন নয়; বরং এটি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একটি মজবুত সেতুবন্ধন তৈরি করার এবং বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা

“'আল-উম্মাহ' ইন্টারনেটে বিদ্যমান হাজারো সাইটের ভিড়ে কেবল আরেকটি সংখ্যার সংযোজন নয়; বরং এটি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একটি মজবুত সেতুবন্ধন তৈরি করার এবং বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব ঘোচানোর একটি আন্তরিক প্রয়াস। আমরা এটিকে এমন একটি মুক্ত আঙিনা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, যেখানে মুসলিমরা কোলাহল, সস্তা জনপ্রিয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থেকে বৈশ্বিক মুসলিম ভাইদের মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলো জানতে পারবে এবং নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে”

বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব ঘোচানোর একটি আন্তরিক প্রয়াস। আমরা এটিকে এমন একটি মুক্ত আঙিনা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, যেখানে মুসলিমরা কোলাহল, সস্তা জনপ্রিয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থেকে বৈশ্বিক মুসলিম ভাইদের মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলো জানতে পারবে এবং নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে।

যদি আমরা চিন্তাশীল আলোচনার একটি নতুন দুয়ার খুলতে পারি, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় একটি কল্যাণকর ধারণা পৌঁছে দিতে পারি, কিংবা বাংলাদেশের একজন পাঠককে সিরিয়ার প্রকৃত পরিস্থিতি অথবা একজন আরব অনুসারীকে ডেনমার্কের মুসলিমদের জীবন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বুঝতে সাহায্য করতে পারি-তবেই আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণীর প্রকৃত বাস্তবায়ন করতে পারব:

'মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতির উদাহরণ একটি দেহের মতো; যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন পুরো দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।' ■

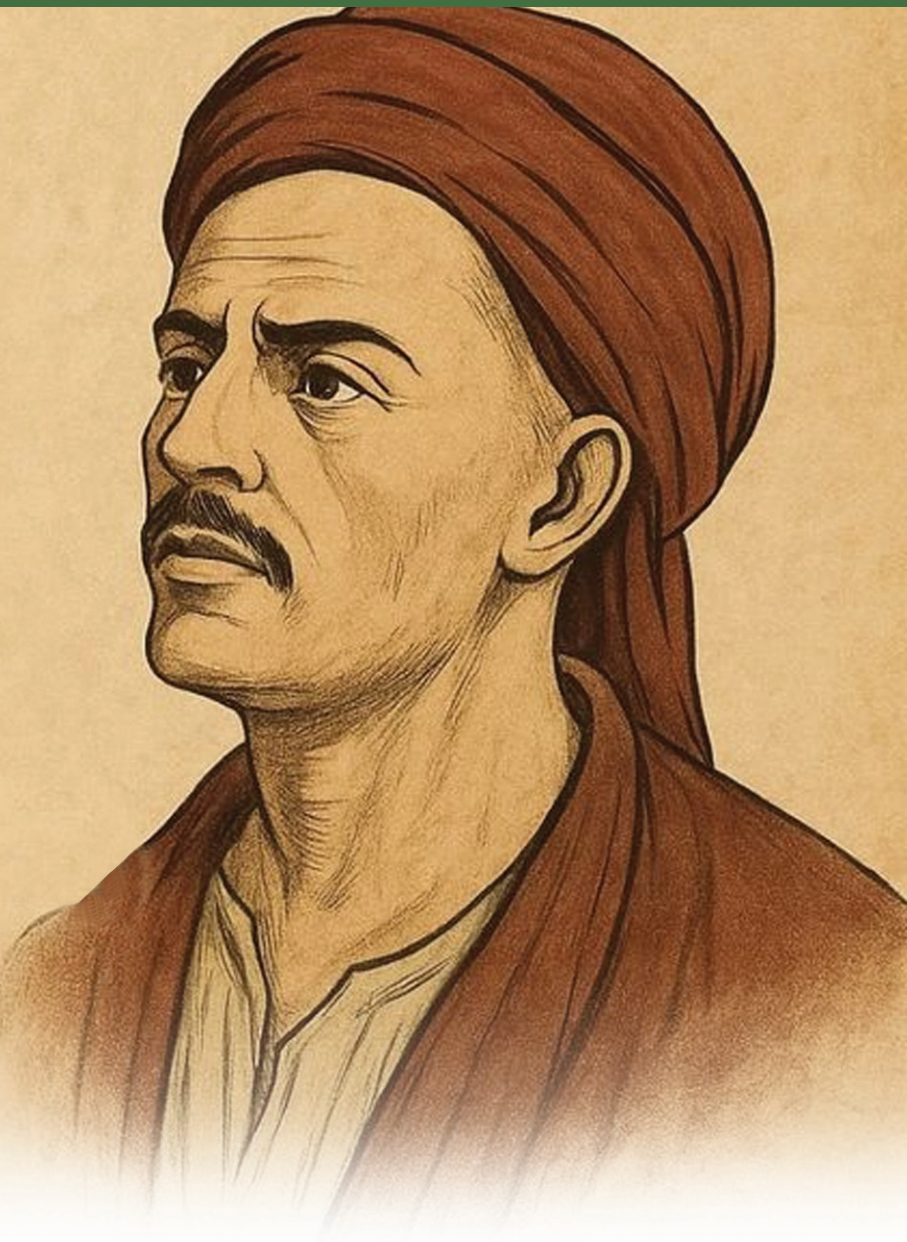

ইউনুস এমরে
তুর্কিদের অনুপ্রেরণাদায়ী এক মরমি কবি

প্রফেসর নাফিসা দৌইদা

ইউনুস এমরে (১২৪০-১৩২১) ছিলেন একজন মরমি কবি, যিনি সারাজীবন ভালোবাসা, মানবতার বন্ধন এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। তাঁর কবিতা তুর্কি সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক চিন্তাজগতে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। তিনি তুর্কি কাব্য ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন এবং সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় কবি হিসেবে আজও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ইউনুস এমরে প্রায়ই তুরস্কের জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি প্রারম্ভিক তুর্কি সুফিবাদ বা মরমিবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি এবং স্তবগান ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-চিন্তাভিত্তিক ভক্তিমূলক কবিতার পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত। তবে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নির্ভরযোগ্য তথ্য খুবই সীমিত। ইতিহাসবিদরা শুধু কিছু খণ্ডিত তথ্যই জানেন–ধারণা করা হয় তিনি আনুমানিক

১২৪০ সালের দিকে বর্তমান তুরস্কের সাকারিয়া প্রদেশের আনাতোলিয়া অঞ্চলের সারিকয় এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

যদিও বহু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যকর্মে ইউনুস এমরেকে তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে, তবে তাঁর জন্মপরিচয় বা শৈশব-যৌবন সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। অধিকাংশ গবেষণাই তাঁর কবিতা এবং তুর্কি লোকসাহিত্য ও সুফি চিন্তাধারায় তার চিরস্থায়ী গুরুত্বের ওপর কেন্দ্রীভূত। তবে তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে তাঁর চরিত্রের আধ্যাত্মিক গভীরতা, বৌদ্ধিক বিকাশ এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁর গভীর আত্মিক সম্পর্কের এক স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ইউনুস এমরের সর্বজনীন মানবতাবাদী বার্তার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো ১৯৯১ সালকে তাঁর জন্মের ৭৫০তম বার্ষিকীতে "ইউনুস এমরে আন্তর্জাতিক বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করে।

ইউনুস এমরের জীবনকথা

ঐতিহাসিক নথিপত্রের অভাবে ইউনুস এমরের ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে ঠিক কোন কোন প্রভাব কাজ করেছিল তা নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তবুও তাঁর কবিতাগুলো তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রা ও অন্তর্জগত সম্পর্কে অনেক কিছুই প্রকাশ করে।

ইউনুস এমরে ত্রয়োদশ শতকের অস্থির সময় এবং চতুর্দশ শতকের শুরুতে আনাতোলিয়ায় বসবাস করতেন। এটি ছিল মঙ্গোল আক্রমণ, সেলজুক সাম্রাজ্যের দুর্বল হয়ে পড়া এবং উসমানীয় রাষ্ট্রের উত্থানের সূচনালগ্নে এক অস্থির ও পরিবর্তনশীল যুগ। রাজনৈতিক অস্থিরতা, গোত্রভিত্তিক বাস্তুচ্যুতি এবং সামাজিক দুর্দশা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যেও মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জন্য গভীরভাবে আকুল ছিল।

এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই ইউনুস এমরে আশার এক কণ্ঠস্বর হিসেবে আবির্ভূত হন। সহজ কিন্তু গভীর ভাষায় তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতেন এবং তাঁদেরকে বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও নৈতিক পরিশুদ্ধতার পথে উৎসাহিত করতেন। তাঁর কবিতা আত্মাকে জাগ্রত করার এবং মানবতাকে ঘৃণা, দুর্নীতি ও হতাশা থেকে দূরে সরিয়ে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

জালালউদ্দিন রুমির মতোই ইউনুস এমরে বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা পার্থিব বিভাজন অতিক্রম করে ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর মধ্যেই নিহিত।

তাঁর খ্যাতি ধীরে ধীরে নিজ গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, আজারবাইজান থেকে শুরু করে বলকান অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এর ফলে তিনি আনাতোলিয়ার মধ্যপন্থী ইসলামী মরমিবাদের অন্যতম প্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ছিল ঐশ্বরিক ভালোবাসা এবং মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত।

তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার পঙ্ক্তিতে তিনি বলেন–

> আমি ইউনুস এমরে,
> আমার প্রতিটি অতিক্রান্ত দিন আমার আত্মার
> ভেতরের আগুনকে আরও উসকে দেয়।
> এই পৃথিবী আর পরকাল–দু'জায়গাতেই আমার
> একমাত্র চাওয়া,
> আমি শুধু তোমাকেই চাই, তুমিই আমার একমাত্র
> প্রয়োজন।

ইউনুস এমরের কবিসত্তা

ইউনুস এমরে ছিলেন জনগণের কবি। তিনি সুফিবাদের গভীর প্রভাব বহন করলেও সাধারণ মানুষের লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং এমন একটি ভাষায় কথা বলতেন যা সকলের কাছেই সহজবোধ্য ছিল।

তাঁর যুগের বহু আলেম ও কবি যেখানে আরবি বা ফারসি ভাষায় লিখতে পছন্দ করতেন, সেখানে ইউনুস এমরে সহজ-সরল তুর্কি ভাষায় কবিতা রচনা করার পথ বেছে নেন। এর ফলে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও দৃঢ় করেন এবং তুর্কি সাহিত্যিক অভিব্যক্তির ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

তাঁর ভাষা ছিল স্নিগ্ধ ও আবেগে সমৃদ্ধ, যেখানে জীবন্ত চিত্রকল্প, আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা এবং জীবন, মৃত্যু ও মানব-নিয়তির গভীর প্রতিফলন ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতা সরলতার সঙ্গে দার্শনিক গভীরতাকে একত্রে ধারণ করেছে।

আনাতোলিয়ার জনগণ তাঁকে একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ও জাতীয় প্রতীক হিসেবে গভীরভাবে গ্রহণ করেছিল। তাঁর ভ্রমণকাহিনী নিয়ে নানা লোককথা বা জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে, আর পরবর্তীতে সমগ্র আনাতোলিয়াজুড়ে তাঁর নামে বহু দরগাহ ও সমাধি গড়ে ওঠে–যা ছিল মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

তাঁর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের কারণে ইউরোপীয় সাহিত্য ইতিহাসে তাঁকে প্রায়ই দান্তে আলিগিয়েরি, ফ্রান্সেসকো পেত্রারকা এবং দেসিদেরিয়ুস এরাসমাসের মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

শান্তি ও প্রেমের প্রতিমূর্তি

ইউনুস এমরে মানবজাতিকে শান্তি, ভালোবাসা, সহনশীলতা এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যের পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি ঘৃণাকে মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার চেষ্টা করতেন।

সাম্প্রদায়িক উগ্রতা, চরমপন্থা ও সামাজিক ভয়ের এক কঠিন সময়ে ইউনুস এমরে যেন এক শ্বেতপায়রা শান্তির

পায়রার মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বয়ে এনেছিলেন বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও অন্তরের গভীর শান্তির বার্তা।

তাঁর সুন্দর পঙ্‌ক্তিগুলোর মধ্যে একটি হলো–

> পবিত্র ও বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে পৌঁছাতে চাই,
> আমাকে হতে দাও প্রস্ফুটিত গোলাপ,
> অথবা আনন্দে গান গাওয়া এক বুলবুলি পাখি,
> আর আমার আবাস হোক সেই প্রিয় বন্ধুর বাগান।

তিনি আরও লিখেছেন–

> ভালোবাসার অগ্নিকুণ্ডে আমি দগ্ধ হই,
> আর যত বেশি তীব্রভাবে আমি জ্বলি
> ততই মধুর হয়ে ওঠে আমার সুবাস।
> আমি কখনোই ম্লান হব না
> কেননা আমার জলধারা আসে আত্মার ঝরনা থেকে।

ইউনুস এমরের স্বপ্নময় আধ্যাত্মিকতা তাঁর যুগের উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। রুমির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর বজায় রেখে রহস্যময় দর্শনকে অসাধারণ উষ্ণতা ও মানবিকতার কবিতায় রূপান্তরিত করেছিলেন।

তাঁর কবিতা সর্বদা ঐশ্বরিক ঐক্য, করুণা এবং মানব সুখের চিরন্তন অনুসন্ধানকে গুরুত্ব দিয়েছে।

সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রতি তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত আহ্বানগুলোর মধ্যে একটি–

> এসো, আমরা সবাই বন্ধু হই,
> অন্তত একটি মুহূর্তের জন্য।
> চলো, জীবনের ভার নিজেদের জন্য সহজ করে তুলি।
> চলো, আমরা প্রেমিক ও সহচরের মতো জীবনযাপন করি,
> কেননা এই পৃথিবী কারও জন্য চিরস্থায়ী নয়।

ইউনুস এমরের চিরন্তন উত্তরাধিকার

আজকের দ্রুতগতির বস্তুবাদী জীবনের মধ্যেও ইউনুস এমরের উত্তরাধিকার সমানভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে। তাঁর কবিতা আজও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, নৈতিক আত্মজিজ্ঞাসা এবং সাংস্কৃতিক গৌরবের এক অনন্য উৎস হিসেবে বিদ্যমান।

তাঁর নাম বহনকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউট, যা তুর্কি ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করা একটি অগ্রণী সাংস্কৃতিক সংস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর অসংখ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তুরস্ক ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

এই কেন্দ্রগুলোর জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী তুর্কি সংস্কৃতি, পর্যটন এবং টেলিভিশন নাটকের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়েছে, বিশেষ করে আরব দেশসমূহ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এগুলো তুরস্কের সাংস্কৃতিক উন্মুক্ততা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের বৃহত্তর প্রচেষ্টাকেও প্রতিফলিত করে।

মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরেও ইউনুস এমরে ভালোবাসা, বিনয়, আধ্যাত্মিকতা এবং মানব ঐক্যের এক চিরকালীন প্রতীক হিসেবে বিদ্যমান। তিনি এমন এক কবি, যাঁর বার্তা আজও আধুনিক বিশ্বের কাছে গভীর ও শক্তিশালীভাবে প্রতিধ্বনিত হয়। ■

ডিজিটাল অপপ্রচারের তাত্ত্বিক ভিত্তি

ম্যাজিক বুলেট থেকে ফেসবুক অ্যালগরিদম

নাবিল সাবা
মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনে স্নাতক ও ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টে স্নাতকোত্তর, সিরিয়া

আমাদের জন্য হুমকি হলো মিথ্যা তথ্য নিজে নয়, বরং সেই চেতনার খণ্ডিতকরণ, যা সত্যকে অনাকাঙ্ক্ষিত করে তোলে।

জ্ঞানের ভোজসভা থেকে মিশ্র বিশৃঙ্খলার টেবিল পর্যন্ত

দুই দশক আগে, ডিজিটাল বিপ্লব জ্ঞানের এক স্বর্ণযুগের ঘোষণা দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি ছিল একই সঙ্গে সহজ এবং বিশাল: সবার জন্য তথ্য, সবার জন্য প্রকাশনা–যেন আমরা সেই জ্ঞানতন্ত্রের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, যার স্বপ্ন

আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছিলাম; এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র, যেখানে কোনো নজরদারি বা মধ্যস্বত্বভোগী থাকবে না, যেখানে ধারণাগুলো অবাধে প্রবাহিত হবে এবং প্রতিটি ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সচেতনতার সঙ্গে নিজের ইচ্ছামতো যা খুশি বেছে নিতে পারবে।

কিন্তু এই ডিজিটাল বিপ্লবের ভেতরে কিছু একটা ঘটে গেল: যে পরিবেশে এটি বিকশিত হলো তা ছিল গভীরভাবে জটিল, তথ্যের বিপুল পরিমাণে–সত্য ও মিথ্যা উভয়ই–আরও ভারী হয়ে উঠেছিল, এবং আরও বিপজ্জনকভাবে, তথ্যগুলোকে প্রেরকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মিশিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছিল।

আজ আপনি আপনার হাতে ফোন নিয়ে একটি সহজ প্রশ্ন টাইপ করেন: এই ভ্যাকসিন কি নিরাপদ? অমুককে কে হত্যা করেছে? এই নীতির পেছনের সত্য কী? মুহূর্তের মধ্যেই আপনার সামনে হাজির হয় হাজারো পরস্পরবিরোধী উত্তর। এক পক্ষ দাবি করে এটি একটি উপকারী চিকিৎসা; অন্য পক্ষ শপথ করে বলে এটি একটি প্রাণঘাতী বিষ। উভয় পক্ষই এমন প্রমাণ উপস্থাপন করে যা যাচাই করা যায় না। এক পক্ষ কথিত ফাঁস হওয়া নথি প্রকাশ করে; অন্য পক্ষ বড় ধরনের এক কেলেঙ্কারি উন্মোচন করে। এসব পৃষ্ঠা দেখতে আসল সংবাদপৃষ্ঠার মতোই, কিন্তু এগুলোর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ অজানা ব্যক্তিদের হাতে। অত্যন্ত নিপুণভাবে তৈরি ভিডিওগুলো এমনভাবে বানানো হয় যে, তা হয় আপনার বিবেককে নাড়া দেয়, নয়তো আপনার রাগ উসকে দেয়–এমনকি চিন্তা করার সময়ও আপনাকে দেয় না।

তখন আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন: কাকে বিশ্বাস করবেন? হয়তো আপনি হতাশ হয়ে সেই প্রথম উত্তরটিকেই আঁকড়ে ধরেন, যা আপনাকে আশ্বস্ত করে বা আপনার পূর্বধারণার সঙ্গে মিলে যায়। আপনাকে প্রথম যে বিষয়টি প্রতারণা করে, তা হলো আপনার নিজের এই বিশ্বাস যে আপনি কোনো চূড়ান্ত সত্য পড়ছেন বা দেখছেন। অথবা আপনি হয়তো এক ধরনের কুয়াশাচ্ছন্ন উদাসীনতায় ডুবে যান, বলে ফেলেন: "সবাই মিথ্যাবাদী; কোনো সত্যই নেই।"এটাকেই আমরা বলি অর্থের বিশৃঙ্খলা এবং ধারণার বিভ্রান্তি: সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষমতা, অথ বা এমন এক মিশ্রণের অস্তিত্ব যেখানে মধুর ভেতরে লুকানো থাকে বিষ। এখন আর শুধু মিথ্যাই গ্রহণকারীর চেতনাকে হুমকি দেয় না, বরং সেই খণ্ডিতকরণও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, যা সত্যকেই অনাকাঙ্ক্ষিত করে তোলে।

এই প্রবন্ধটি পাঁচটি লেখার একটি ধারাবাহিকের প্রথম অংশ, যা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে যে কীভাবে এই রূপান্তর ঘটেছিল এবং কীভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো মুক্তির স্থান থেকে কৃ ত্রিম চেতনা নির্মাণের ক্ষেত্র বা মঞ্চে পরিণত হলো। এর উত্তর শুরু হয় যোগাযোগ-তত্ত্বগুলোর মাধ্যমেই।

সমস্যার ভূমিকা : অর্থ কীভাবে তৈরি হয় এবং তার ভেতরের বিশৃঙ্খলা

মানব যোগাযোগে অর্থ কেবল শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমন অনেকেই মনে করেন। এটি কোনো প্রস্তুত বার্তা নয়, যা এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির কাছে সরাসরি হস্তান্তরিত হয়। বাস্তবে, অর্থ গড়ে ওঠে গ্রহণকারীর মনের ভেতরে–প্রাপ্ত পাঠ্য, গ্রহণকারীর জীবনপরিবেশ, পূর্ব অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ এবং মানসিক প্রয়োজনের মধ্যকার এক জটিল আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে।

এই ধারণাটিই ক্রিটিক্যাল মিডিয়া থিওরির মূল ভিত্তি। মিডিয়া কোনো বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা পরিবেশন করে না; বরং এটি এমন কিছু উপকরণ ও প্রেক্ষাপট সরবরাহ করে, যার মাধ্যমে গ্রহণকারী নিজের ব্যক্তিগত অর্থ নির্মাণ করে। সম্পাদকীয় নীতিমালার ভিত্তিতে অবশ্যই দিকনির্দেশনা ও প্রভাব প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে তা এই প্রক্রিয়াকে বিলুপ্ত করে না। এটিকেই বলা হয় অর্থ-নির্মাণ (Meaning-Making)। আর যখন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক শক্তি এই উপকরণগুলো নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তারা কার্যত সেই অর্থকেই নিয়ন্ত্রণ করে, যার মাধ্যমে ব্যক্তিরা তাদের ধারণা গড়ে তোলে–সম্পূর্ণভাবে নয়, তবে তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার মতো পর্যাপ্ত মাত্রায়।

অর্থের বিশৃঙ্খলা (Chaos of Meaning) তখনই সৃষ্টি হয়, যখন গ্রহণকারীর প্রেক্ষাপটকে গঠনকারী সব মানসিক মানচিত্র ভেঙে পড়ে। এটি একটি বিপরীত অবস্থা, যেখানে অভিন্ন বা যৌথ রেফারেন্সগুলো ভেঙে যায় এবং লক্ষ লক্ষ পরস্পরবিরোধী বর্ণনা ও "সত্য" কোনো নির্ভরযোগ্য যাচাইব্যবস্থা ছাড়াই ডিজিটাল পরিসরে ভিড় করে। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যেকোনো দাবি সম্ভব হয়ে ওঠে এবং যেকোনো সত্যই সন্দেহের মুখে পড়ে। ব্যক্তিরা একে একে নিজেদের ইকো চেম্বারে (echo chambers) ফিরে যায়, যেখানে তারা শুধু তাদের বিশ্বাসকে পুনরাবৃত্তি করে এমন কণ্ঠই শোনে। এই পরিস্থিতি বিভ্রান্তিকর তথ্যের (disinformation) জন্য উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে, কারণ এটি সত্যকে প্রমাণের বিষয় না রেখে বরং পছন্দ বা আনুগত্যের বিষয়ে পরিণত করে; গ্রহণকারীরা কেবল তাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করে এমন বক্তব্যই শোনে।

মিডিয়া স্টাডিজের শুরুতে, গবেষকেরা যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন, সেগুলো আজকের অধিক জটিল গবেষণার প্রেক্ষিতে নিরীহ ও সরল বলে মনে হয় :

- যদি আমরা একটি বার্তা সম্প্রচার করি, তবে কি শ্রোতারা তা বিশ্বাস করবে?
- আমরা কীভাবে বার্তাটিকে আরও স্পষ্ট করতে পারি, যাতে তা সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয়?
- তথ্য প্রেরণের জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম কোনটি?

আজ এসব প্রশ্নকে সরল ও নিরীহ বলে মনে হয়। আরও গভীর স্তরে, এগুলো গ্রহণকারীর জটিলতাকে উপেক্ষা করে: ইতিহাস, সংস্কৃতি, মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন এবং সামাজিক সম্পর্ক। এগুলো যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ভেতরে থাকা ক্ষমতার মাত্রাগুলোকেও উপেক্ষা করে: মাধ্যমটির মালিক কে? কে নির্ধারণ করে কী বলা উচিত? কে একটি বক্তব্যকে অন্যটির চেয়ে বেশি অর্থায়ন করে?

সাধারণ প্রশ্ন এবং সমালোচনামূলক প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথমটি জিজ্ঞাসা করে : "আমরা কীভাবে প্রভাব ফেলি?" আর দ্বিতীয়টি জিজ্ঞাসা করে : "আমরা কেন প্রভাব ফেলি, এবং এই প্রভাব থেকে কে উপকৃত হয়?"

এই প্রবন্ধে, পাশাপাশি পরবর্তী ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলোতে, আমরা প্রথম ধরনের প্রশ্ন থেকে দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নে, কৌশল থেকে সমালোচনায়, ব্যবস্থাপনা থেকে বিশ্লেষণ-বিনির্মাণের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করব।

রৈখিক মডেল : প্রেরক–একটি চ্যানেলের মাধ্যমে বার্তা–গ্রাহক

১৯২০ থেকে ১৯৪০-এর দশকের মধ্যে, সহজ রৈখিক মডেলগুলো এই ক্ষেত্রটিকে আধিপত্য করেছিল; এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল-এর মডেল (১৯২৭) এবং ক্লড শ্যানন ও ওয়ারেন উইভার (১৯৪৯) কর্তৃক বিকশিত মডেল। এই মডেলগুলোতে, যোগাযোগকারীকে কেবল একটি প্রেরণ যন্ত্র হিসেবে দেখা হতো, গ্রহণকারীকে একটি গ্রহণকারী যন্ত্র হিসেবে, এবং বার্তাকে একটি তথ্যের প্যাকেট হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এই মডেলগুলোকে রৈখিক বলা হওয়ার প্রধান পদ্ধতিগত কারণ হলো, তাদের মূল রূপে এগুলোতে প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। রৈখিক যুক্তির মধ্যে, যোগাযোগ প্রক্রিয়া তখনই শেষ হয়ে যায় যখন বার্তাটি গ্রহণকারীর কাছে পৌঁছে যায় এবং তার প্রভাব সৃষ্টি করে; কোনো পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নেই যা গ্রহণকারীকে প্রেরকের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে বা ব্যক্তিগত বোঝাপড়া অনুযায়ী বার্তার গতিপথ পরিবর্তন করতে সক্ষম করে।

এই ধারণা অনুযায়ী, গণমাধ্যম (রেডিও, সংবাদপত্র, সিনেমা) নিজেদের এতটাই শক্তিশালী বলে মনে করত যে তাদের বার্তাগুলো যেন গ্রহণকারীর মস্তিষ্কে নিক্ষিপ্ত একটি বুলেটের মতো, যা মুহূর্তেই বিশ্বাসগুলোকে উল্টে দিতে সক্ষম, অথবা এমন একটি ইনজেকশনের মতো যা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে ধারণাগুলোকে প্রবেশ করিয়ে দেয়; যেন সমাজ একটি সমষ্টি, যা সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তিহীন এবং গণমাধ্যমের বার্তার প্রতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিন্নভাবে অনুগত।

সেই সময়ে যোগাযোগের উদ্দেশ্য, তা রাজনৈতিক প্রচার হোক বা বেতার টেলিযোগাযোগ প্রকৌশল, ছিল মূলত উৎস থেকে গন্তব্যে বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করা, পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা নয়। এই মডেলগুলো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার অস্তিত্বকে স্বীকার করত না: এই সমীকরণের মধ্যে, গ্রহণকারীর প্রেরকের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর বা বার্তার গতিপথ পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ ছিল না।

ন্যায্যভাবে বলতে গেলে, এই মডেলগুলো ছিল তাদের পরিবেশেরই ফল। রেডিও, প্রাথমিক টেলিভিশন, মুদ্রিত সংবাদমাধ্যম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার প্রচারণামূলক পোস্টার–সবই ছিল প্রযুক্তিগতভাবে রৈখিক যোগাযোগের রূপ। রেডিও একই সংবাদ শত শত বার সম্প্রচার করত, আর মানুষ তাদের ঘরে বসে শুনত, একই মুহূর্তে ঘোষকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানানো বা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার কোনো সক্ষমতা ছাড়াই। সুতরাং রৈখিক মডেলটি সেই সময়ের প্রভাবশালী প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

আজকের দৃষ্টিতে তাদের আপাত সরলতা সত্ত্বেও, এই মডেলগুলো একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা আজও একাডেমিক গবেষণাকে তাড়িত করে: কোনো গণমাধ্যমের বার্তা কি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেতনার প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে সরাসরি এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে? "হাইপোডার্মিক নিডল" বা "ম্যাজিক বুলেট" তত্ত্বের দেওয়া উত্তর ছিল ইতিবাচক: হ্যাঁ, গণমাধ্যম যে কোনো ধারণা জনগণের মধ্যে এমনভাবে সঞ্চার করতে সক্ষম, যেমন একজন চিকিৎসক শিরায় ওষুধের ডোজ ইনজেক্ট করেন। তবে এই উত্তর, যেমন আমরা দেখব, পরবর্তীতে ভেঙে দেওয়া হয় এবং তারপর আরও জটিল রূপে পুনর্গঠিত করা হয়।

প্রথম সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া (লাজারসফেল্ড এবং সীমিত প্রভাবের)

এই তত্ত্বগুলো খুব শিগগিরই অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণের ভারে ভেঙে পড়ে, বিশেষত যেগুলো পাওয়া যায় পল লাজারসফেল্ড এবং তাঁর দলের বিখ্যাত গবেষণায়, যা ১৯৪০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় এরি কাউন্টিতে পরিচালিত হয়েছিল (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet, 1948)। এই গবেষণাটি শর্তাধীন ও সঞ্চিত প্রভাব (conditional and cumulative effects)-এর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি স্থাপন করে, যা বিশ্লেষণ করে কীভাবে গণমাধ্যম দীর্ঘমেয়াদে সমাজের জ্ঞানগত ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে এবং জনসমাজের এজেন্ডা নির্মাণ করে, কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক আচরণগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করার পরিবর্তে।

এই গবেষণার অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফল দেখিয়েছে যে গণমাধ্যমের বার্তাগুলো কোনো সামাজিক শূন্যতার মধ্যে কাজ করে না: এগুলো সামাজিক সম্পর্ক এবং মতামত-নেতা (opinion leaders) নামক ঘটনাটির মাধ্যমে ছাঁকা হয়, পুনর্গঠিত হয় এবং আবার নির্মিত হয়। এটি গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া অধ্যয়ন থেকে সরিয়ে আন্তঃক্রিয়া ও সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে যায়। যোগাযোগ তত্ত্ব ধীরে ধীরে তাৎক্ষণিক আচরণগত পরিবর্তন পরিমাপ থেকে সরে এসে দীর্ঘমেয়াদি জ্ঞানগত ও সঞ্চিত প্রভাব বিশ্লেষণের দিকে বিকশিত হয়, যা সমাজের জন-এজেন্ডা গঠনে ভূমিকা রাখে।

নির্বাচনের সময় কী ঘটেছিল?

এই গবেষণার আগে প্রধান ধারণা ছিল যে গণমাধ্যম (সংবাদপত্র ও রেডিও) ভোটারদের যেকোনো বার্তায় 'সংক্রমিত'করতে পারে এবং তাদের ভোট যেভাবে চাইবে সেভাবে পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু লাজারসফেল্ড এবং তাঁর দল ৩,০০০ ভোটারের একটি সাধারণ নমুনা অনুসরণ

করেন, যাদের মধ্যে থেকে ৬০০ ভোটারের একটি গভীর দীর্ঘমেয়াদি প্যানেল নির্বাচন করা হয় এবং সাত মাসের একটি সময়কালে বারবার তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এর ফলাফল কী ছিল?

- ৫৩% ভোটার প্রচারণার সময় কখনোই তাদের মত পরিবর্তন করেননি এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভোট দিয়েছেন।
- মাত্র ২৬% তাদের মত পরিবর্তন করেছিলেন; এরা ছিলেন সেইসব ব্যক্তি যারা গণমাধ্যমের সংস্পর্শে সবচেয়ে কম ছিলেন এবং তাদের চারপাশের মানুষ–যেমন প্রতিবেশী, সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন।
- ২১% ভোটার প্রচারণার সময় দোদুল্যমান ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সংযোগের প্রভাবে তারা আবার তাদের মূল দলের পক্ষেই ভোট দিতে ফিরে যান।

এভাবেই "মতামত-নেতা" (Opinion Leaders) ধারণা এবং "দ্বি-ধাপ প্রবাহ" (Two-Step Flow) তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এই গবেষণার ফলাফল দেখিয়েছে যে গণমাধ্যম সরাসরি সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করে না; বরং এটি প্রথমে মতামত-নেতাদের–যেমন কর্মী, শিক্ষিত ব্যক্তি এবং যারা গণমাধ্যমের সাথে বেশি সংযুক্ত–প্রভাবিত করে, যারা পরে তাদের ঘনিষ্ঠ সামাজিক বৃত্তকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে প্রভাবিত করে।

আমাদের সময়ে কেন এই শিক্ষা এত শক্তিশালীভাবে ফিরে এসেছে?

ইউটিউব ও টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মে নতুন মতামত-নেতা (influencers), স্বাধীন কনটেন্ট নির্মাতা এবং এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপের বন্ধ গ্রুপের যুগে, দ্বি-ধাপ প্রবাহ (two-step flow) তত্ত্ব আবারও গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে এসেছে। তবে আজকের মূল পার্থক্য হলো, ডিজিটাল ভ্রান্ত তথ্যের শক্তিগুলো আধুনিক বুদ্ধিমান প্রযুক্তির সহায়তায় ডিজিটাল যোগাযোগের পরিবেশকেই পুনর্গঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এটি ঘটেছে স্বয়ংক্রিয় অ্যালগরিদমিক অ্যাকাউন্ট স্থাপনের মাধ্যমে, যেগুলো মানব ব্যবহারকারীদের সমাজতাত্ত্বিক ও যোগাযোগগত আচরণ অনুকরণ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের পুঁজিবাদী সক্ষমতা–যার মাধ্যমে তারা লক্ষ লক্ষ অনুসারী থাকা মতামত-নেতাদের কিনে নিতে পারে এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের গ্রুপে প্রবেশ করতে পারে, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারি অনুপস্থিত থাকে এবং আন্তঃব্যক্তিক আস্থাকে কাজে লাগানো হয়।

জ্ঞানগত দৃষ্টান্তগত পরিবর্তন : ধারণা গঠনের তত্ত্বসমূহ এবং সমষ্টিগত চেতনার প্রকৌশল

১৯৭০-এর দশকের শুরু থেকে, গণমাধ্যম গবেষণায় একটি গভীর রূপান্তর ঘটে, যা তিনটি প্রধান তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, এবং আজও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এগুলো একটি বিপ্লবী ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল: গণমাধ্যম বাস্তবতাকে সরবরাহ করে না; বরং এটি বাস্তবতাকে উৎপাদন করে।

১- এজেন্ডা-সেটিং তত্ত্ব (McCombs & Shaw, 1972)

এই তত্ত্বটি দেখিয়েছে যে গণমাধ্যম সবসময় মানুষকে কী ভাবতে হবে তা বলতে সফল হয় না, কিন্তু তারা মানুষকে কী নিয়ে ভাবতে হবে তা নির্ধারণে অত্যন্ত দক্ষ; এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণের অগ্রাধিকারের মানসিক শ্রেণিবিন্যাস স্থাপন করে। প্রতিদিন হাজারো বিষয়ে ভরা একটি বিশ্বে, যে ব্যক্তি বা শক্তি নির্ধারণ করতে পারে কোন বিষয়গুলো শিরোনামে আধিপত্য করবে এবং কোনগুলো উপেক্ষিত

ও প্রান্তিক হয়ে যাবে, সেই-ই সমষ্টিগত চেতনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই ভ্রান্ত তথ্য সবসময় মিথ্যার ওপর নির্ভর করে না; কখনো কখনো একটি গৌণ বিষয়ে মনোযোগ তৈরি করে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোকে প্রান্তিক করে দেওয়াই যথেষ্ট।

২- ফ্রেমিং তত্ত্ব (Erving Goffman, 1974)

গফম্যানের মতে, গণমাধ্যম ঘটনাগুলোকে নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করে না; বরং তারা সেগুলোকে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যামূলক কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে "ফ্রেম" করে। এই ফ্রেম একটি ঘটনার কিছু দিককে সামনে নিয়ে আসে, অন্য দিকগুলোকে আড়াল করে, এবং গ্রহণকারীকে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যার দিকে পরিচালিত করে। তাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো "কী ঘটেছিল?" নয়, বরং "এই ঘটনাটি কীভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে?" এটি কি একটি সন্ত্রাসী হামলা, নাকি একটি প্রতিরক্ষামূলক শহীদী অভিযান? একটি গণ-আন্দোলন, নাকি একটি সাম্প্রদায়িক সংঘাত? কেবল ফ্রেমই এই প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করে।

৩- কাল্টিভেশন তত্ত্ব (George Gerbner, 2002)

এই তত্ত্বটি সাংস্কৃতিক শর্তায়নের প্রধান প্রভাবকে উন্মোচিত করেছে এবং দেখিয়েছে যে নির্দিষ্ট ও তীব্র গণমাধ্যম বিষয়বস্তুর (যেমন সহিংসতা) দীর্ঘস্থায়ী ও ধারাবাহিক সংস্পর্শ কেবল কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তাৎক্ষণিক মনোভাব পরিবর্তন করে না, বরং সমষ্টিগত চেতনার মধ্যে বাস্তবতার একটি বিকৃত ধারণা স্থাপন করে। ফলে, যারা প্রতিদিন ও বছরের পর বছর ধরে দীর্ঘ সময় টেলিভিশন দেখে (নিরবচ্ছিন্ন গণমাধ্যম বিষয়বস্তু গ্রহণের মাধ্যমে), তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে পৃথিবী বাস্তবের তুলনায় অনেক বেশি বিপজ্জনক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত (গবধহ ডড়ৎষফ ঝুহফৎড়সব)। তাই গণমাধ্যম শুধু আপনার মতামত পরিবর্তন করে না; এটি বিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার ধারণাকেই পুনর্গঠন করে এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্নির্মাণ করে। এটি ভ্রান্ত তথ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ। এর উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে মিথ্যা বলা নয়, বরং তাদেরকে আগেই নকশা করা একটি সমান্তরাল বিশ্বে বাস করানো।

জ্ঞানগত প্রকৌশল এবং জটিল অপতথ্যের কাঠামো: অগ্রাধিকারের বিন্যাস থেকে শুরু করে বিকল্প বাস্তবতার শর্তায়ন পর্যন্ত

ডিজিটাল মিডিয়া ভ্রান্ত তথ্যের জ্ঞানগত প্রকৌশলে এই ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থার কাঠামোগত রূপ একটি কঠোরভাবে সংগঠিত গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ পায়। কার্যগতভাবে এটি শুরু হয় সমষ্টিগত মনোযোগের মানসিক শ্রেণিবিন্যাসকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (এজেন্ডা-সেটিং), এরপর আসে ফ্রেমিং প্রক্রিয়া, যা ব্যাখ্যামূলক কাঠামো স্থাপন করে এবং নির্দিষ্ট আদর্শিক প্রেক্ষাপটকে সেবা দেওয়ার জন্য দৃষ্টিভঙ্গির কোণ নির্বাচন করে।

এরপর এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ হয় বিষয়বস্তুর ঘন এবং ধারাবাহিক প্রবাহের মাধ্যমে, যা সাংস্কৃতিক চাষাবাদ (পঁষঃরাধঃরড়হ) প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়; এই প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদে কাজ করে ধারণাকে আকার দেয় এবং গ্রহণকারীর চেতনাকে মানকায়িত করে। এর ফলস্বরূপ বাস্তব বাস্তবতাকে প্রতিস্থাপন করে অস্তিত্বের একটি বিকৃত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় এবং তথাকথিত "বিকল্প বাস্তবতা"উৎপন্ন হয়।

চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জনগণের মনের মধ্যে একটি মিথ্যা বা খণ্ডিত চেতনা তৈরি করা, যা প্রেরকের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহৃত হয়।

অ্যালগরিদম কেন নিরপেক্ষ নয়?

আজকের অপতথ্যের প্রক্রিয়াগুলো যে পরিবেশে কাজ করে, তার প্রকৃতি বোঝা ছাড়া তাত্ত্বিক চিত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়: সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর অ্যালগরিদম।

এই অ্যালগরিদমগুলো মূলত একটি একক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল: প্ল্যাটফর্মের মুনাফা সর্বাধিক করা। এবং তারা এটি কীভাবে অর্জন করে? (Zuboff, 2019) ব্যবহারকারীর ইন্টারঅ্যাকশন সময় দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে। ব্যবহারকারীরা যত বেশি সময় ধরে কনটেন্ট দেখেন এবং যত বেশি ইন্টারঅ্যাক্ট করেন (লাইক, শেয়ার, মন্তব্য), তত বেশি বিজ্ঞাপন তাদের সামনে প্রদর্শিত হতে পারে, এবং এর ফলে প্ল্যাটফর্মের মুনাফাও তত বৃদ্ধি পায়।

এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, অ্যালগরিদমগুলো এমন বিষয়বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয় যা শক্তিশালী আবেগ সৃষ্টি করে (রাগ, ভয়, উচ্ছ্বাস, দুঃখ), কারণ শক্তিশালী আবেগ ব্যবহারকারীর সম্পৃক্ততা দীর্ঘায়িত করে। ভুল তথ্য, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তৈরি হোক, শান্ত ও নির্ভুল তথ্যের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরভাবে শক্তিশালী আবেগ সৃষ্টি করে। ২০১৮ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (MIT)-তে পরিচালিত একটি বিখ্যাত গবেষণায় গবেষকরা ১,২৬,০০০-এরও বেশি টুইট ক্যাসকেড বিশ্লেষণ করেন এবং দেখতে পান যে মিথ্যা গল্পগুলো সত্য গল্পের তুলনায় ৭০% দ্রুত ছড়ায়, ৩০% বেশি দূর পর্যন্ত পৌঁছায় এবং ৩০% বেশি বিস্তৃত দর্শকের কাছে পৌঁছে যায় (Vosoughi, Roy & Aral, 2018)। আরও বিস্ময়করভাবে, গবেষকরা দেখতে পান যে এই বিস্ময়কর পার্থক্যের জন্য মূলত দায়ী ছিল মানুষ–স্বয়ংক্রিয় বট নয়।

সুতরাং, প্ল্যাটফর্মগুলোর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য (সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা) এবং ভ্রান্ত তথ্য প্রচারকারীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য (চেতনাকে পরিচালিত করা) একটি করুণ সমন্বয়ে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়। প্ল্যাটফর্মগুলো নিজে ভ্রান্ত তথ্যকে সরাসরি উদ্দেশ্য হিসেবে চায় না, তবুও তাদের অ্যালগরিদম–যা দেখার সময় দীর্ঘায়িত করার জন্য নকশা করা হয়েছে–একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে সত্যের উপর মিথ্যার বিজয় ঘটার সুযোগ তৈরি হয়। ■

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুসন্ধানে

আসরার তালুকদার, পিএইচডি

একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আমার উপলব্ধির যাত্রা শুরু হয় ১৯৮০-এর দশকে, আমার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সময়কালে, যখন আমি একটি ইসলামী সংগঠনে যোগ দিই। তখন ইসলামকে কেবল সংকীর্ণ অর্থে একটি ধর্ম হিসেবে বোঝা হতো না। আমাদের কাছে এটি উপস্থাপন করা হয়েছিল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে–যা ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। আমাদের তরুণ মন স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণায় পৌঁছেছিল যে, ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল কিছু বাস্তব কারণও। উদাহরণস্বরূপ, সুদবিহীন আর্থিক ব্যবস্থা কেবল অনানুষ্ঠানিকভাবে চালানো সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ও নিয়ন্ত্রণ। একইভাবে জুয়া বা পতিতাবৃত্তির মতো সামাজিক অনাচার নিষিদ্ধ করতে প্রায়ই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই কাঠামোর মধ্যেই 'ইকামাতে দীন'-অর্থাৎ ইসলামের প্রতিষ্ঠা–ধারণাটি

শুধু যুক্তিসংগতই নয়, বরং অপরিহার্য বলেও মনে হতো; যা ন্যায়বিচার, কল্যাণ এবং একটি নৈতিক শৃঙ্খলার প্রতিশ্রুতি দিত-যার অভাব আমরা মুসলিম বিশ্বের অনেক জায়গাতেই অনুভব করতাম।

তখন আমাদের আরও বলা হতো যে, ঐতিহাসিকভাবে ইসলামী ব্যবস্থা কেবল মুসলমানদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলমানদের জন্য যাকাত এবং অমুসলিমদের জন্য জিজিয়া–এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। কিন্তু এই পার্থক্যগুলোর গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য–বিশেষ করে আধুনিক সমান নাগরিকত্বের ধারণার সাথে এর সম্পর্ক–সেই সময়ে আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। এই প্রশ্নগুলো অনেক পরে এসে সামনে আসে।

মরক্কো: রাষ্ট্রের কাছে একজন বহিরাগত হয়ে ওঠা

১৯৯২ সালে আমি উচ্চশিক্ষার জন্য মরক্কোতে যাই। এটি সেই অর্থে কোনো ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না, যেভাবে আমি কল্পনা করেছিলাম।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি আমার রাষ্ট্র ছিল না। এর ব্যবস্থার মধ্যে আমার কোনো অংশীদারিত্ব ছিল না। হঠাৎ করেই আমি বুঝতে পারলাম, যে জায়গাটিকে আমি নিজের বলে মনে করতাম, আমি আর সেখানে বাস করি না–আর যে দেশে আমি বাস করছি, সেটি আমার নয়। আমি একজন বহিরাগত হয়ে গেলাম, এমন একজন যে ভেতরে সম্পৃক্ত না হয়ে কেবল পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

কাছাকাছি আলজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছিল, কারণ সামরিক বাহিনী একটি ইসলামী দলের নির্বাচনী বিজয় বাতিল করে দিয়েছিল। একই সময়ে তুরস্কে ভিন্ন একটি ঘটনা ঘটছিল। ওয়েলফেয়ার পার্টি গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় উঠে আসে, কিন্তু কয়েক বছর পর সামরিক বাহিনী তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। তবে আলজেরিয়ার বিপরীতে, তুরস্কের ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলন ধীরে ধীরে বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে না গিয়ে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

স্পেন: সত্যের অনুসন্ধান

১৯৯৮ সালে আমি সেখানে গেলে একেবারেই ভিন্ন একটি বৌদ্ধিক পরিবেশের মুখোমুখি হই। আমি বামপন্থী, নাস্তিক এবং ধর্মের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই এমন অনেক মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু আমার বিস্ময়ের বিষয় হলো, তাদের মধ্যে আমি ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, জনকল্যাণ এবং ন্যায্যতার প্রতি গভীর অঙ্গীকার দেখতে পাই।

তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষায় আগ্রহী ছিল–এর মধ্যে ধর্ম পালনের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত ছিল–যদিও তারা নিজেরা সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল না। এটি আমাকে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছিল: এমনকি যদি একটি ইসলামী রাষ্ট্র বৈচিত্র্যকে গ্রহণও করে, তবে কি

তা সত্যিকারের সমান নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে পারে?

একই সঙ্গে আমি আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করলাম, যা আমাকে আরও গভীরভাবে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। যেসব সরকারকে আমি স্বভাবতই অপছন্দ করতাম, সেগুলোর অনেকেই ছিল আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র–যেমন কমিউনিস্ট চীন বা কিউবা, ইহুদি ইসরাইল, এবং কিছুটা ইসলামী ইরান। এগুলো রাজতন্ত্র ছিল না; তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ব্যবস্থাও ছিল। তবুও যারা তাদের আদর্শ বা পরিচয়ের অংশ ছিল না, তারা কখনোই পুরোপুরি সমান নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো না।

তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলত কাজ করত সেই মূল পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষের জন্যই। অন্যরা–তারা যে আদর্শগত হোক বা ধর্মীয়–ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে প্রান্তেই থেকে যেত। এই পর্যবেক্ষণটি আমার মনে গেঁথে যায়: আদর্শভিত্তিক কোনো রাষ্ট্র কি সত্যিই সবার জন্য সমান অধিকারভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে?

জার্মানি : কণ্ঠস্বরহীন সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

স্পেনের পর আমি জার্মানিতে চলে যাই এবং সেখানে ওয়ার্ক ভিসায় তিন বছর অবস্থান করি। সেখানে আবারও আমি এমন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই, যেখানে আমি একটি ব্যবস্থার ভেতরে বসবাস করছিলাম, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তার অংশ ছিলাম না।

আমি অন্য নাগরিকদের মতো কর দিতাম। বিশ্বের অন্যতম উন্নত কল্যাণব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করতাম। বাস্তব অনেক দিক থেকেই আমি অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তবুও আমার কোনো রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর ছিল না। আমি সেই ব্যবস্থার সুবিধা নিতে পারতাম, কিন্তু সেটিকে গঠন বা প্রভাবিত করতে পারতাম না।

এই পার্থক্যটি সময়ের সাথে সাথে আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্তর্ভুক্তি (integration) আর নাগরিকত্ব

(citizenship) এক জিনিস নয়। সুযোগ-সুবিধা পাওয়া আর অংশগ্রহণ করা একই বিষয় নয়। কোনো ব্যক্তি একটি ব্যবস্থার ভেতরে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে, কিন্তু সেটিকে প্রভাবিত করার অধিকার না থাকলে সেখানে একটি মৌলিক অভাব থেকেই যায়।

রাজনৈতিক ইসলামের পুনর্বিবেচনা

এই পর্যায়ে এসে আমি আমার আগের ধারণাগুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করি, কিন্তু তখনও আমার কাছে কোনো বিকল্প কাঠামো ছিল না। পরে তুরস্ক ও তিউনিসিয়ার মতো দেশের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি ভিন্ন সম্ভাবনা ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে। তুরস্কে জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি কোনো ইসলামী রাষ্ট্র চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি। বরং তারা একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর ভেতরেই কাজ করেছে, যেখানে ইসলামী মূল্যবোধ রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সামাজিকভাবে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

তিউনিসিয়ায়, আরব বসন্তের পর ইসলামী দল এননাহদা সংঘাতের পরিবর্তে সমঝোতার পথ বেছে নেয়। তারা এমন একটি সংবিধানকে সমর্থন করে যা একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নিশ্চিত করে–যেখানে ধর্মকে রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না, আবার ধর্মকে বাদও দেওয়া হয় না।

এই উদাহরণগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, সম্ভবত ইসলামকে রাষ্ট্রের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং এটি সমাজের ভেতরেই একটি বিকল্প হিসেবে বিকশিত হতে পারে–চর্চা, সংস্কৃতি এবং প্রভাবের মাধ্যমে–কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ ছাড়াই।

বাংলাদেশ: আদর্শিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে

বাংলাদেশ শুরুতে একটি তরুণ বহুদলীয় গণতন্ত্র ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে এক ধরনের কঠোর কর্তৃত্ববাদী শাসনে পরিণত হয়, যেখানে বাস্তবে এক ব্যক্তি ও এক দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামপন্থী দল এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী দল–উভয়েই প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায় এবং রাজনৈতিকভাবে দমন-পীড়নের শিকার হয়ে "অন্য"হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।

এরপর আসে ২০২৪ সালের জুলাইয়ের ঘটনা। ছাত্রদের নেতৃত্বে একটি গণঅভ্যুত্থান পুরো রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দেয়। এখানে শুধু আন্দোলনের ব্যাপকতাই নয়, বরং রাজনীতিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তখন আর ইসলামপন্থী বনাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এমন বিভাজন মুখ্য ছিল না; বরং তা হয়ে দাঁড়ায় জনগণ বনাম শাসনব্যবস্থা।

এই পরিবর্তন একটি বড় পার্থক্য তৈরি করে। ভিন্ন আদর্শিক পটভূমির মানুষ একসাথে দাঁড়ায়, আর কিছু সময়ের জন্য রাজনীতিকে নির্ধারণ করা বিভাজনগুলো অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে পড়ে–পরিবর্তনের যৌথ দাবির তুলনায়।

পরবর্তী ২০২৬ সালের নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলগুলো তুরস্কের মতো উদাহরণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কঠোর আদর্শিক কাঠামোর বদলে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থার কথা বলে। তারা ভালো ফল করে এবং প্রধান বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়। তবে একটি সন্দেহ তখনও থেকে যায়: তারা যদি ক্ষমতায় আসে, তবে কি তারা অন্যদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে?

আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের বাস্তবতা

এ পর্যায়ে এসে আমি দেখতে পাই, এসব অভিজ্ঞতার পেছনে একটি গভীর কাঠামোগত সমস্যা কাজ করছে। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র ইতিহাসের সাম্রাজ্যগুলোর থেকে অনেক ভিন্ন। অতীতে ক্ষমতা মূলত শাসকদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল, আর জনগণ ছিল সমান নাগরিক নয়, বরং প্রজার মতো অবস্থানে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো এই ধারণা যে, রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের সম্মিলিতভাবে।

প্রতিটি নাগরিকের–অন্তত নীতিগতভাবে–সমানভাবে অংশগ্রহণের এবং এমনকি নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার রয়েছে। এই কাঠামোর ভেতরে কোনো আদর্শভিত্তিক একচেটিয়া রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। যদি ক্ষমতায় প্রবেশ নির্ভর করে বিশ্বাস বা পরিচয়ের ওপর, তবে সমান নাগরিকত্বের ধারণাটিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়।

ফুকুয়ামা থেকে বর্তমান বাস্তবতা

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা "ইতিহাসের সমাপ্তি" ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে উদার গণতন্ত্রের আর কোনো কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কিছু সময়ের জন্য এই ধারণা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলি একটি আরও জটিল বাস্তবতা তুলে ধরে। ব্রেক্সিট থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচন এবং জাতিগত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান–সব মিলিয়ে উদার গণতন্ত্র চাপের মুখে পড়েছে বলে মনে হয়।

পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েছে। বিশ্বায়ন ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির বিস্তারে সেই শিল্পখাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা একসময় মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে টিকিয়ে রেখেছিল। একই সঙ্গে বৈশ্বিক সেবা অর্থনীতি প্রতিযোগিতা আরও তীব্র করেছে, ফলে স্থানীয় মানুষের জন্য সুযোগ পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে।

জনসংখ্যাগত পরিবর্তনও অতিরিক্ত চাপ তৈরি করেছে। জন্মহার কমে যাওয়া এবং জনসংখ্যার বার্ধক্যের কারণে শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসনের মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। কিন্তু কাঠামোগত সমস্যা–যেমন শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন বা সামাজিক অভিযোজন–সমাধান না করে রাজনীতি অনেক সময় সহজ ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। গভীর সামাজিক উদ্বেগগুলোর জন্য অভিবাসীদেরই সহজ লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, যা অনেক সময় জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

একই সময়ে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও ঘটছে। ভোগবাদ মানুষের অগ্রাধিকার বদলে দিয়েছে। সামাজিক নর্মের পরিবর্তন পারিবারিক কাঠামোকেও রূপান্তরিত করেছে। এসব পরিবর্তন জটিল হলেও তাদের সম্মিলিত প্রভাব স্পষ্ট–এক ধরনের অস্থিরতার অনুভূতি, যেন আগের মতো স্থিতিশীলতা আর নেই। এমন পরিবেশে আধ্যাত্মিক ও পরিবেশগত সংকটের মধ্যে উদার গণতন্ত্রও আর ততটা নিরাপদ মনে হয় না।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, পরিবার, সমাজ এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য যে বিকল্প চিন্তাগুলো–যেমন "ডোনাট ইকোনমিকস" বা "ডিগ্রোথ ইকোনমিকস"–সেগুলো আমাকে আমার স্কুল জীবনের ইসলামী সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তখন এসব আমার কাছে ছিল কেবল কিছু স্লোগান মাত্র। এখন সেগুলোকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত এবং প্রয়োজনীয় মনে হয়।

বিশ্বাস ও বাস্তবতা

এই পুরো যাত্রাপথে আমার ইসলামে বিশ্বাস একই রকমই থেকেছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি বিশ্বাস (faith) এবং বাস্তব তথ্য (fact)-এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করতে শিখেছি। বিশ্বাস হলো এমন কিছু যা মানুষ জীবনে ধারণ করে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভব করে; এটি প্রমাণ করা যায় না একইভাবে যেভাবে পরীক্ষামূলক সত্য প্রমাণ করা হয়। এই উপলব্ধি একটি নির্দিষ্ট বিনয় তৈরি করে। অন্যরা ভিন্নভাবে বিশ্বাস করতে পারে, এমনকি বিশ্বাস নাও করতে পারে–এতে আমার নিজের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায় না।

একই সঙ্গে আমি দেখেছি, রাজনৈতিক জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়া কত গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যখন মানুষকে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন ক্ষোভ শুধু ব্যবস্থার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সেই পরিচয়ের দিকেও প্রসারিত হতে পারে যার সঙ্গে সেই ব্যবস্থা যুক্ত।

নতুন উপলব্ধির দিকে

ধীরে ধীরে আমার চিন্তা এমন এক দিকে পরিবর্তিত হয়েছে, যা আমি আমার তরুণ বয়সে কল্পনাও করিনি। ইসলামের প্রতিষ্ঠা কোনো ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক প্রকল্প হিসেবে হওয়া জরুরি নয়। বরং এটি একটি সামাজিক লক্ষ্য হিসেবে বাস্তবায়িত হতে পারে–আলোচনা, উদাহরণ এবং পারস্পরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্র থাকে নিরপেক্ষ। এটি বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং কোনো নাগরিককে বাধ্য করে না। এর বৈধতা নির্ভর করে সমান নাগরিকত্বের ওপর, কোনো আদর্শিক আধিপত্যের ওপর নয়।

উপসংহার

পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এই পৃথিবীতে সহাবস্থান কোনো বিকল্প বিষয় নয়। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজকে সকলের জন্যই জায়গা তৈরি করতে হয়। আমার অভিজ্ঞতার উপলব্ধি খুবই সহজ: নিজের জন্য সমান নাগরিকত্ব তখনই নিরাপদ হয়, যখন তা সবার জন্য নিশ্চিত করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সমাজের ভেতরে স্বাধীন পছন্দ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিকশিত হয়–রাষ্ট্রীয়ভাবে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নয়। রাজনৈতিক পরিসরকে অবশ্যই উন্মুক্ত, যৌথ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক থাকতে হবে। ■

আমেরিকায় মুসলিম ঐতিহ্যের গোপন উত্তরাধিকার

“ক্যারিব” (Carib) নামটি–যেখান থেকে “ক্যারিবিয়ান” (Caribbean) শব্দের উৎপত্তি–একটি কুরআনিক আরবি শব্দ। এই শব্দ ও এর সংশ্লিষ্ট রূপগুলো প্রায় তিন হাজার বছর ধরে আরবি ভাষার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং পবিত্র কুরআনে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো প্রায়ই আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম আল-কারীব (Al-Qareeb)–অর্থাৎ “অতি নিকটবর্তী” বা “সন্নিকট”–হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুলতানা আফরোজ, পিএইচডি
ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়, কিংস্টন, জ্যামাইকা

ক্যারিবীয় অঞ্চলে মুসলমানদের ইতিহাস ও উত্তরাধিকার শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম ২০২৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর গায়ানায় অনুষ্ঠিত হয়, যা ইসলামিক ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র (আইআরসিআইসিএ) এবং ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) আয়োজন করে।

১৪৯২ সালে আল-আন্দালুসে (মুসলিম স্পেন) আট শতাব্দী ধরে চলা মুসলিম শাসনের অবসান ঘটলে, আন্দালুসীয় মুসলিম নাবিকদের মাধ্যমে ইসলাম ওয়েস্ট ইন্ডিজে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়; এ নাবিকরাই কলম্বাসের আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার অভিযানে দিকনির্দেশনা দিয়েছিল।

আটলান্টিক নৌচালনায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রশিক্ষিত এই নাবিকরা কেবলমাত্র নৌচালকই ছিলেন না; ধ্বংসপ্রাপ্ত আল-আন্দালুস ত্যাগ করার সময় তাদের অনেকেই ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শান্তির সন্ধান করছিলেন। ১৪৯৪ সালে কলম্বাসের দ্বিতীয় অভিযানে তারা জ্যামাইকা দ্বীপে পা রাখেন–যেখানে ছিল বৃক্ষাচ্ছাদিত পর্বত, জলপ্রপাত, বালুকাময় সৈকত এবং স্বচ্ছ নীল সমুদ্র। কলম্বাস ও তাঁর খ্রিস্টান সঙ্গীদের কাছে অজানা হলেও, এই আরবি ভাষাভাষী মুসলিম নাবিকরা ইতোমধ্যেই এই অঞ্চল, এর দ্বীপসমূহ এবং এর মানুষের সাথে পরিচিত ছিলেন।

"ক্যারিব" নামটি–যা থেকে "ক্যারিবিয়ান" শব্দের উৎপত্তি–একটি কুরআনিক আরবি শব্দ। আরবিতে এটি "ক্বারীব" হিসেবে লেখা হয়, যার অর্থ "নিকটবর্তী," "কাছাকাছি," "ঘনিষ্ঠ," "প্রতিবেশী" বা "আত্মীয়।" এর বহুবচন/বিশেষণ রূপ "ক্বারীবুন", যা "ক্যারিবিয়ান" বা "ক্যারিবান"-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা হয়। এই শব্দগুলো প্রায় তিন হাজার বছর ধরে আরবি ভাষার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং পবিত্র কুরআনে এটি বহুবার পাওয়া যায়, যেখানে এটি প্রায়ই আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়–আল-ক্বারীব, অর্থাৎ নিকটবর্তী।

এই শব্দমূলের ইতিহাস কলম্বাসের আগের বহু শতাব্দী পুরোনো। "ক্যারিব" এবং "ক্যারিবিয়ান" শব্দগুলোর ইউরোপীয় নথিভুক্ত প্রথম ব্যবহার কেবলমাত্র ১৫০০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায়, যেখানে এগুলো প্রায়ই নরমাংসভোজনের সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর বিপরীতে, আরবি ভাষায় "ক্বারীব" (Qareeb) এবং "ক্বারীবুন" (Qareebun) শব্দগুলো বহুদিন ধরে ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে–যেমন নিকটতা, প্রতিবেশীসুলভ আচরণ এবং মানবিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা।

আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং আটলান্টিক নৌচালনায় অভিজ্ঞ আন্দালুসীয় মুসলিম নাবিকদের ধারণা করা হয় যে, তারা উত্তর আটলান্টিকের পশ্চিমাঞ্চল–যা মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চল এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলো দ্বারা সীমাবদ্ধ–এই অঞ্চলকে "ক্বারীবুন" (Caribbean) অঞ্চল হিসেবে নামকরণ করেছিলেন এবং এর অধিবাসীদের "ক্বারীব" (Caribs) নামে অভিহিত করেছিলেন, যা কলম্বাসের আগমনের বহু আগেই ঘটেছিল। ঐতিহাসিক বিবরণে, যেমন দশম শতাব্দীর ইতিহাসবিদ আলি আল-মাসউদি রচিত "দ্য মেডোজ অব গোল্ড"-এ উল্লেখ রয়েছে যে, আল-আন্দালুসের মুসলিম নাবিকরা, খাশখাশ ইবন সাঈদ ইবন আসওয়াদ-এর নেতৃত্বে, ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে আটলান্টিক মহাসাগরে যাত্রা করেছিলেন এবং সেখান থেকে ধনসম্পদসহ ফিরে এসেছিলেন। কলম্বাস-পূর্ববর্তী এ ধরনের মহাসাগর অতিক্রমকারী অভিযানের অনুরূপ বিবরণ অন্যান্য নাবিকদের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে চীনের অ্যাডমিরাল ঝেং হে-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই অঞ্চলে ইসলামী উপস্থিতি অব্যাহত থাকে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আনা দাস মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমে, যাদের জ্যামাইকার বাগানগুলোতে কাজ করার জন্য আনা হয়েছিল। তাদের অনেকেই দাসত্বের বিরুদ্ধে পালিয়ে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে–যা এক ধরনের হিজরত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে–এবং তারা স্বাধীন মারুন সম্প্রদায় (উম্মাহ) প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে বিচ্ছিন্নতা ও দমন-পীড়নের কারণে প্রকাশ্যভাবে ইসলামী চর্চা দুর্বল হয়ে

পড়লেও, এই সম্প্রদায়গুলো তাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের কিছু উপাদান সংরক্ষণ করে রাখে।

এই ভাষাগত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ আমেরিকার ইতিহাসচর্চার পুনর্মূল্যায়নের আহ্বান জানায়, যেখানে মুসলিম নাবিক এবং আফ্রিকান মুসলমানদের এই অঞ্চলের প্রাথমিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রায়ই উপেক্ষিত অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

টীকা / সূত্রসমূহ

[১] “ক্যারিব” এবং “ক্যারিবিয়ান” শব্দগুলো আরবি “ক্বারীব” (Qareeb) এবং “ক্বারীবুন” (Qareebun)-এর সমতুল্য।

[২] আলি আল-মাসউদি রচিত “দ্য মেডোজ অব গোল্ড” (৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)-এর বিবরণ দেখুন।

[৩] সুলতানা আফরোজ, “অদৃশ্য কিন্তু অজেয়: জ্যামাইকার মারুন ও দাস আফ্রিকানদের ইসলামী ঐতিহ্য” (লন্ডন: অস্টিন অ্যান্ড ম্যাকলি, ২০১২), পৃষ্ঠা ৬৮-৭২।

[৪] রিচার্ড প্রাইস (সম্পাদিত), “মারুন সোসাইটিজ: আমেরিকাসের বিদ্রোহী দাস সম্প্রদায়” (বাল্টিমোর ও লন্ডন: জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬)।

সংক্ষেপিত রূপ: “জ্যামাইকার ক্যারিব প্রতিবেশী মুসলিম মারুনরা”, ক্যারিবীয় অঞ্চলে মুসলমানদের ইতিহাস ও উত্তরাধিকার, আইআরসিআইসিএ, ইস্তাম্বুল, ২০২৫, পৃষ্ঠা ৭৯-১১২।

স্প্যানিশ/ইংরেজি শব্দ “ক্যারিব (Carib)” এবং “ক্যারিবিয়ান (Caribbean)” আরবিতে “ক্বারীব” (Qareeb) এবং “ক্বারীবুন” (Qareebun) হিসেবে লেখা হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

“ওয়া ইযা সা-আলাকা ‘ইবাাদি ‘আন্নি ফা-ইন্নি ক্বারীবুন, উজীবু দা‘ওয়াতাদ-দা‘ই ইযা দা‘আনি, ফালইয়াস্তাজীবূ লি ওয়ালইউ’মিনূ বি লা‘আল্লাহুম ইয়ার্শুদূন”

অর্থাৎ: “আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বলো) নিশ্চয়ই আমি তাদের নিকটবর্তী (ক্বারীবুন)। যখন কেউ আমাকে ডাকে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারা যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যাতে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারে।” (পবিত্র কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৬)

এছাড়াও সূরা আল-বাকারা-এর ২:২১৪ আয়াতে “ক্বারীব” শব্দটি নিকট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে “ক্যারিব” বা “ক্যারিবীয়” শব্দটি বিভিন্নভাবে বিদ্যমান বলে উল্লেখ করা হয়। সূরা সাবা-তে “ক্বারীব” শব্দটি নিকট অর্থে এসেছে, যেমন আয়াতে বলা হয়েছে: “...কিন্তু যদি আমি হেদায়েত পাই, তবে তা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার প্রতি ওহি বা অনুপ্রেরণার মাধ্যমে; নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন এবং সর্বদা নিকটবর্তী।” (সূরা সাবা, ৩৪:৫০)

এছাড়াও সূরা আন-নিসা ৪:৭৭, সূরা হুদ ১১:৬১ ও ১১:৮১, সূরা সাবা ৩৪:৫১, সূরা আশ-শুরা ৪২:১৭ এবং সূরা হাশর ৫৯:১৫-এও অনুরূপ অর্থে নিকটতা বা “ক্বারীব” ধারণা ব্যবহৃত হয়েছে। ■

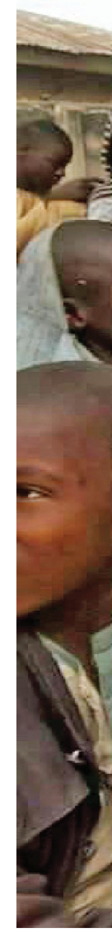

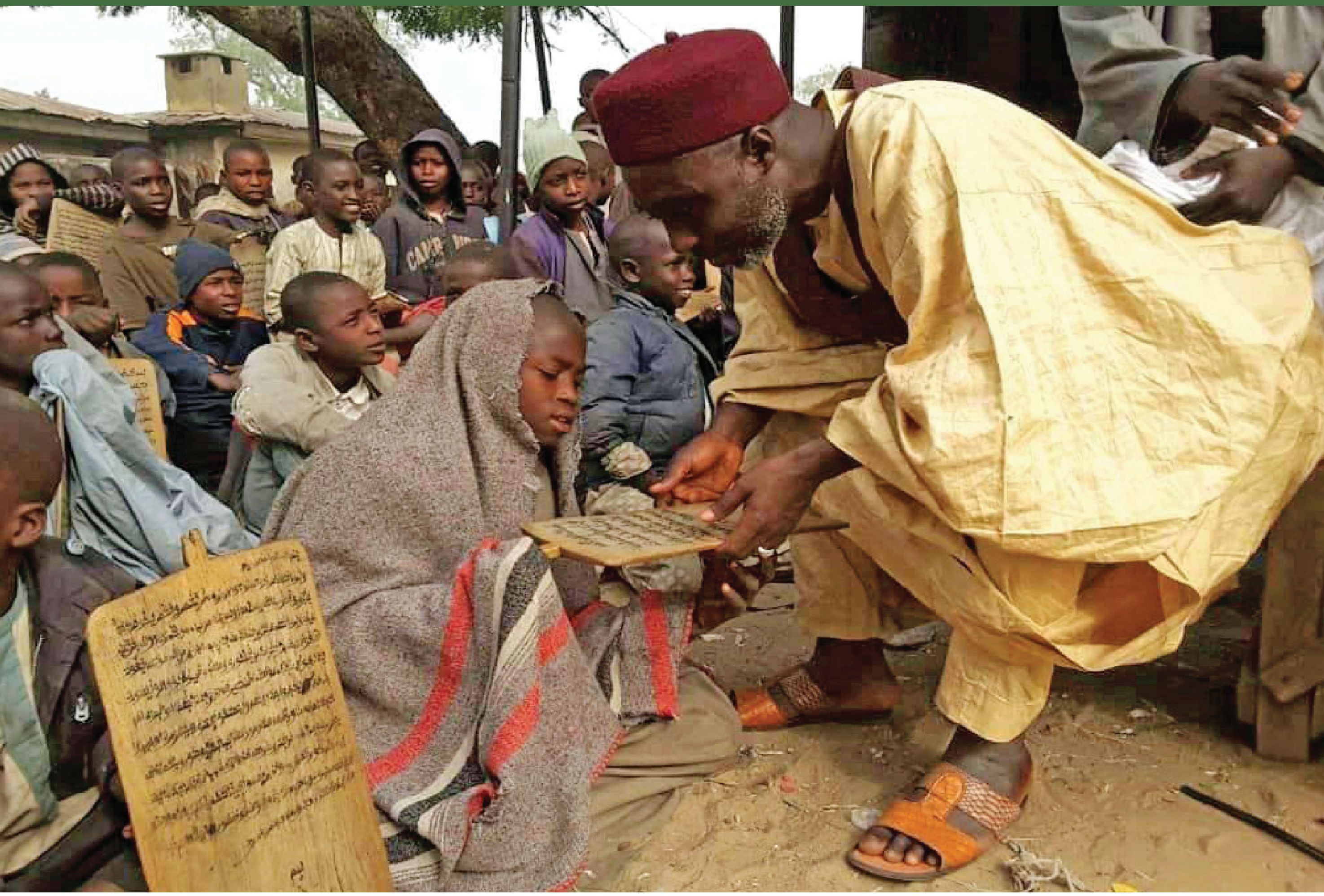

নাইজেরিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও জাতি গঠনের অনুসন্ধানে ইসলামি শিক্ষা

বুসারি কেহিন্দে কামোরুদ্দিন, পিএইচডি
আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক, আদেকুনলে আজাসিন বিশ্ববিদ্যালয়, আকুংবা-আকোকো, ওন্ডো রাজ্য, নাইজেরিয়া

সারসংক্ষেপ

নাইজেরিয়ায় ইসলামিক শিক্ষা বিভিন্ন পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে এবং আরবি শিক্ষাকে আরব উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রায় তিন শতাব্দী (১৭শ থেকে ১৯শ শতক) ধরে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম সুদানের বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকদের জন্য আরবি উৎসসমূহ প্রধান ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নাইজেরিয়ায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে আরবি ভাষা শুধু শিক্ষাদানের মাধ্যমই ছিল না, বরং যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, নাইজেরিয়ার শিক্ষা নীতিমালা প্রায়ই আরবি ও ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি ভাষানীতি, শিক্ষাদান-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এবং বিভিন্ন সামাজিক কারণসহ নানা চ্যালেঞ্জ এখনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বৃহত্তর সমাজে এর কার্যকর প্রভাবকে সীমিত করে রেখেছে।

এই প্রবন্ধে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আরবি ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের রূপান্তরমূলক শক্তি নিহিত রয়েছে। কারণ, এটি এমন একটি মূল্যবোধভিত্তিক জীবনদর্শন গড়ে তোলে যা অতিরিক্ত বস্তুবাদ, দুর্নীতি এবং অবৈধ উপায়ে জীবিকা অর্জনের প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করে–যে সমস্যাগুলো নাইজেরিয়ার প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

ভূমিকা

বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইসলামিক শিক্ষা নাইজেরিয়ায় প্রবেশ করে। উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন সুদানের কিছু অংশ, মরক্কো, মিশর এবং তিউনিসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। বিশেষ করে দশম এবং একাদশ শতক থেকে দক্ষিণ সাহারা অঞ্চলের সঙ্গে এসব অঞ্চলের সক্রিয় বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে ইসলামিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং তা ধীরে ধীরে বর্তমান নাইজেরিয়ার কানেম-বর্নো এবং হাউসা রাজ্যগুলোর মতো এলাকায় পৌঁছে যায়। যদিও এই যোগাযোগের সূচনাকাল নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা কঠিন, তবে ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে এসব সম্পর্কের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হয় (গালাদানসি, ১৯৭১)।

নাইজেরিয়ায় ইসলামিক শিক্ষা : একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

নাইজেরিয়ায় ইসলামিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠায় বহু আলেম ও অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কানোর শাসক ইয়াকুবের শাসনামলে (১৪৫২-১৪৬৩) ফুলানি আলেমরা ফিকহ (ইসলামি আইনশাস্ত্র) এবং ইসলামি ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থসহ সেখানে আগমন করেন। একই সময়ে টিমবাক্টু থেকে আগত মুসলিম আলেমরাও কানোতে এসে ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা প্রদান করেন। পরবর্তীতে খ্যাতিমান আলেম আল-মাগিলি কাটসিনায় অভিবাসন করেন, যা পঞ্চদশ শতকে আরবি ও ইসলামিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু প্রভাবশালী আলেমের জন্ম দেয় (কারীম, ২০১২)।

ইসলামের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী শিক্ষারও প্রসার ঘটে। এটি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং আরবায়ন ও ইসলামায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঔপনিবেশিক যুগের আগে ইসলামী শিক্ষা মূলত অনানুষ্ঠানিক ছিল। তখন কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম বা নিয়মিত শ্রেণি-সময়সূচি ছিল না। শিক্ষার্থীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শিক্ষকদের বাড়ি বা মসজিদে সমবেত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত।

কিছু শিক্ষার্থী একজন শিক্ষকের সঙ্গেই স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকত, আবার কেউ কেউ জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা গ্রহণ করত। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত ছিল না; বরং আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন এবং ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শিতা লাভের মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হতো (আলফা, ২০১৪)।

ঔপনিবেশিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং পশ্চিমা শিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের আশঙ্কার কারণে ইসলামি সমাজগুলো এমন সমন্বিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে, যেখানে ইসলামি ও পশ্চিমা–উভয় ধরনের পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই সঙ্গে আলেমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরবি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সৌদি আরব, সুদান ও মিশরের মতো দেশ থেকে শিক্ষক ও প্রাসঙ্গিক পাঠ্যবই আমদানি করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাইজেরিয়ার আলেমরাও স্থানীয় প্রেক্ষাপট উপযোগী আরবি পাঠ্যবই রচনা করতে শুরু করেন (ইব্রাহীম, ২০০৯)। এসব প্রতিষ্ঠানের স্নাতকেরা পরবর্তীতে ইমাম, দাঈ (ধর্মপ্রচারক), আরবি পণ্ডিত, লেখক, দার্শনিক, দানশীল ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা এবং সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে কাজ করে আসছেন এবং ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করে চলেছেন (ইব্রাহীম, ২০১২)।

ইসলামিক শিক্ষার তাৎপর্য

ইসলামিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের স্রষ্টা সম্পর্কে গভীর সচেতনতা প্রদান করে এবং তাদের শেখায় কীভাবে বিপদ ও সমৃদ্ধি–উভয় অবস্থায়ই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। এই জ্ঞান শোষণের বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে, কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রতারণামূলক "অলৌকিক ব্যবসায়ী"দের শনাক্ত করতে এবং তাদের দ্বারা অসহায় মানুষের শোষণ নিরুৎসাহিত করতে সক্ষম হন। কোভিড-১৯ মহামারি এবং এর লকডাউন পরিস্থিতি ব্যক্তিগতভাবে, একান্তভাবে আল্লাহর প্রতি উপাসনার গুরুত্বকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইসলামিক শিক্ষা আল্লাহভীতি বা তাকওয়া-ভিত্তিক নৈতিক সততা গড়ে তোলে। এই অভ্যন্তরীণ আত্মশুদ্ধি মানুষকে পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যেখানে সরকারি পদক্ষেপ–যেমন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা–ক্রমবর্ধমান অপরাধ হ্রাসে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে ইসলামিক শিক্ষা মানুষকে এমন চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যা ঐশী নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (আবদুল-হামিদ, ২০০৭)।

নাইজেরিয়ায় অপরাধের হার উদ্বেগজনক মাত্রায় পৌঁছেছে,

যেখানে কখনও কখনও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও এতে জড়িত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালে লাগোসে স্পেশাল অ্যান্টি-রবেরি স্কোয়াড (এসএআরএস)-এর চারজন সদস্যকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ডাকাতি, অপহরণ, অবৈধ আটক, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সহিংসতার হুমকির অভিযোগ আনা হয়। একইভাবে, চেকপোস্টে পুলিশের অসদাচরণের মতো উদ্বেগজনক ঘটনাগুলোও ব্যবস্থাগত ব্যর্থতাকে নির্দেশ করে। আরবি/ইসলামিক শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে গভীর সচেতনতা তৈরি করে এবং কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যেও নৈতিক আচরণ বজায় রাখতে উৎসাহিত করে।

তদুপরি, ইসলামিক শিক্ষা এমন একটি মূল্যবোধভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে যা অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষা, দুর্নীতি, ভোগবাদ এবং অবৈধ উপার্জনের পথকে প্রত্যাখ্যান করে–যা নাইজেরিয়ার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সময় পরোক্ষভাবে উৎসাহিত হয়। অপরাধের মূল কারণগুলোর একটি বড় অংশ হলো নিয়ন্ত্রণহীন অর্থলোভ। এর বিপরীতে, ইসলামিক শিক্ষা মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে 'ইবাদাহ (আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহভীতি)-কে গুরুত্ব দেয়। এটি আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদকে নিরুৎসাহিত করে এবং নৈতিক জীবনযাপনের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। নাইজেরিয়ার জাতীয় শিক্ষাদর্শনে এসব নীতির সমন্বয় ঘটানো গেলে অপরাধের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসতে পারে (বিদমোস, ২০০৮)।

জাতি গঠনে ইসলামিক শিক্ষার সম্ভাবনা

আরবি/ইসলামিক শিক্ষা নাইজেরিয়াকে একটি আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত করার বিপুল সম্ভাবনা ধারণ করে। এর প্রধান শক্তিগুলো নিম্নরূপ:

প্রামাণিক জ্ঞানের উৎস: ইসলামিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে ঐশী প্রত্যাদেশকে স্থাপন করে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের স্রষ্টা, জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরকালীন জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে। এটি ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতির বিপরীতে অবস্থান করে, যেখানে অনেক সময় ভোগবাদী বা বিবর্তনভিত্তিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি

প্রচারিত হয়, যা আধ্যাত্মিক সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন। মানুষের ঐশী উৎপত্তি সম্পর্কে প্রামাণিক জ্ঞান একটি অর্থবহ শিক্ষার জন্য অপরিহার্য; এর অভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সমস্যাগুলো সমাধানের প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যায় (বিদমোস, ২০০৮; উইক্রামাসিংহে, ১৯৮৪)।

জ্ঞান সমন্বয় : ইসলামিক শিক্ষা আল্লাহকে স্রষ্টা এবং সকল জ্ঞানের চূড়ান্ত উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যক্রমের মতো এটি ধর্মীয় বিষয়গুলোকে আলাদা খণ্ডে বিভক্ত করে না; বরং এটি আধ্যাত্মিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানকে একীভূত করে, যার ফলে এমন ব্যক্তি গড়ে ওঠে যারা ন্যায়পরায়ণ, ভদ্র, স্বচ্ছ ও আল্লাহভীরু। শুধুমাত্র মানবীয় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি নৈতিক উৎকর্ষতা সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে না বা মানব ও ঐশী সত্তার মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় না।

জবাবদিহিতা ও দায়িত্ববোধ : ইসলামি শিক্ষা কিয়ামতের দিনের ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে, যেখানে প্রত্যেকটি কাজ লিপিবদ্ধ থাকবে এবং কোনো পক্ষপাত বা অব্যাহতি ছাড়াই বিচার করা হবে (কুরআন, আল-ইসরা: ১৩)। শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি বিষয়ে এই বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যাতে দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার চেতনা জাগ্রত হয়।

আত্মার পরিশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন নাফস): ইসলামিক শিক্ষা মানুষের অন্তর বা হৃদয় (ক্বালব)-এর ওপর গুরুত্ব দেয়, যা নিয়ত ও কর্মের কেন্দ্রস্থল হিসেবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

"অমঙ্গলপ্রবণ আত্মা" (আল-আম্মারাহ বিস-সূ', কুরআন ১২:৫৩)

"আত্ম-তিরস্কারকারী আত্মা" (আল-লাওয়াম্মাহ, কুরআন ৭৫:২)

"শান্ত ও প্রশান্ত আত্মা" (আল-মুতমাইন্নাহ, কুরআন ৮৯:২৭)

আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াহ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কর্ম মূল্যায়ন করার একটি অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা অর্জন করে এবং সৎ ও আল্লাহভীতির পথ বেছে নেয় (কুরআন ৯১:৭১০; ৯১:৯)। পাঠ্যক্রম প্রণেতাদের উচিত এই পরিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যাতে ইতিবাচক চরিত্র গঠন করা যায়।

উপসংহার

নাইজেরিয়ার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অপহরণ, সশস্ত্র ডাকাতি, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় অসামঞ্জস্য এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতারণাসহ বহু গুরুতর জাতীয় সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। এর বিপরীতে ইসলামিক শিক্ষা একটি কার্যকর বিকল্প ও প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারে। এটি শালীনতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সৎ জীবনযাপনকে উৎসাহিত করে এবং একই সঙ্গে প্রতারণা, দুর্নীতি, হত্যা, অপহরণসহ অন্যান্য সামাজিক অপরাধকে কঠোরভাবে নিন্দা করে।

> ইসলামিক শিক্ষা আল্লাহকে স্রষ্টা এবং সকল জ্ঞানের চূড়ান্ত উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যক্রমের মতো এটি ধর্মীয় বিষয়গুলোকে আলাদা খণ্ডে বিভক্ত করে না; বরং এটি আধ্যাত্মিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানকে একীভূত করে, যার ফলে এমন ব্যক্তি গড়ে ওঠে যারা ন্যায়পরায়ণ, ভদ্র, স্বচ্ছ ও আল্লাহভীরু

ইসলামিক নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে নাইজেরিয়া এমন নাগরিক গড়ে তুলতে পারে যারা দায়িত্বশীল, সতর্ক এবং আল্লাহভীরু হবে এবং একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে। এই পদ্ধতি ব্যক্তিকে আত্মপর্যালোচনার দক্ষতা প্রদান করে এবং অন্তরের পবিত্রতা বজায় রাখতে সহায়তা করে—যা চিন্তা ও কর্মের মূল উৎস। কুরআনিক শিক্ষা স্থানীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করলে তা সহজেই সমাজবিরোধী আচরণ নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং আল্লাহভীতির মাধ্যমে মানবসেবায় উৎসাহিত করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত শান্তি, নিরাপত্তা এবং জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সুপারিশসমূহ

পাঠ্যক্রম প্রণেতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রের অংশীজনদের উচিত নাইজেরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা, যাতে যেকোনো উপায়ে সম্পদ অর্জনের প্রবণতাকে উৎসাহিত করে এমন ভোগবাদী পক্ষপাত দূর করা যায়। জাতীয় আনুগত্যের সঙ্গে নৈতিক আচরণ ও ন্যায়পরায়ণতাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

ইসলামিক শিক্ষার প্রমাণিত সম্ভাবনাগুলো—বিশেষ করে ঐশী সত্যের সমন্বিত রূপ গ্রহণ করা উচিত। এই নৈতিক নীতিগুলো ইসলামের একচেটিয়া নয়; বাইবেলসহ অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যেও অনুরূপ মূল্যবোধ বিদ্যমান। অংশীজনদের উচিত নিয়ন্ত্রিতহীন ভোগবাদের পরিবর্তে সামগ্রিক চরিত্র গঠনের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা, একই সঙ্গে স্বীকার করা যে ইসলাম বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনকে একটি বৈধ ও গ্রহণযোগ্য কর্ম হিসেবে সমর্থন করে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন বিশুদ্ধ মানসিকতা গড়ে তোলা, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং প্রকৃত জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ■

বিশ্বজুড়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বাস্তবতা বর্তমান ও ভবিষ্যত

শাবান আব্দুল রহমান
প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক,আল-মুজতামা'(কুয়েত)
ইসলামী বিশ্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখক

এই গবেষণাটি সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আলোকে বিশ্বজুড়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের জীবনযাত্রা এবং পরিস্থিতির বৈচিত্র্য বোঝার লক্ষ্যে একটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের বাস্তবতাকে পরীক্ষা করে। এটি জনসংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমান এবং তার নির্ভুলতা, একীকরণ ও প্রান্তিকীকরণের ধরণ, সেইসাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অভিবাসন এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতার উত্থানের সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলোও অন্বেষণ করে। গবেষণাটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলিম সংখ্যালঘুদের বাস্তবতা উচ্চ মাত্রার বৈচিত্র্য এবং অসমতা দ্বারা চিহ্নিত, এবং তাদের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা কোনো একক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং, এর জন্য একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন যা এই সংখ্যালঘুদের বসবাসকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশকে বিবেচনায় নেয়।

বিশ্বজুড়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিষয়টি রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত সমসাময়িক গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কারণ মুসলিমরা ভৌগোলিকভাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে এবং তাদের বসবাসের প্রেক্ষাপটও বৈচিত্র্যময়। আজকের মুসলিমরা শুধু মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেই বাস করে না; ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে শুরু করে এশিয়া, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে ছোট-বড় মুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে, এই সংখ্যালঘুদের অবস্থা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। যেখানে কিছু সংখ্যালঘু গোষ্ঠী উচ্চ স্তরের একীকরণ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণ অর্জন করেছে, সেখানে অন্যরা এখনও বৈষম্য, প্রতিনিধিত্বের অভাব, বা তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সীমিত স্বীকৃতির মতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

এই বৈষম্যগুলো মুসলিমদের ধর্মীয় পরিচয় এবং তারা যে সমাজে বাস করে তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করে। এগুলো আরও প্রশ্ন তোলে যে, আধুনিক রাষ্ট্রগুলো সমান নাগরিকত্বের কাঠামোর মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে কতটা পরিচালনা করতে পারে, এবং মুসলিম সংখ্যালঘুরা কীভাবে দ্রুত বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, তা বিশ্বায়ন, অভিবাসন বা সমসাময়িক রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের সাথেই সম্পর্কিত হোক না কেন।

ধারণাগত কাঠামো: সামাজিক ও রাজনৈতিক সাহিত্যে, সংখ্যালঘু বলতে বৃহত্তর সমাজে বসবাসকারী এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়, যাদের ধর্মীয়, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে পৃথক করে। তবে, সংখ্যালঘুর ধারণাটি শুধুমাত্র সংখ্যার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এটি সমাজের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সম্পর্কের প্রকৃতি, একটি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবের মাত্রা এবং তাদের প্রাপ্ত আইনি ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির স্তরের সাথেও যুক্ত।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংজ্ঞায়িত করার জন্য যে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড গ্রহণ করা যেতে পারে, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে সংখ্যাগত মানদণ্ডের উপর নির্ভর করেন, আবার অন্যরা বিশ্বাস করেন যে সংখ্যালঘুদের আকার নির্বিশেষে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান অনুসারে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অধিকন্তু, কিছু প্রেক্ষাপটে "মুসলিম সংখ্যালঘু" ধারণাটি আরও জটিল হয়ে ওঠে, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব নেই, অথবা অন্য ক্ষেত্রে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগতভাবে সংখ্যালঘু হলেও তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক উপস্থিতি রয়েছে।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমানের সমস্যা: বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের বিষয়টি জনসংখ্যাতত্ত্ব ও ধর্মীয় অধ্যয়নের অন্যতম বিতর্কিত বিষয়। বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক হিসাব অনুযায়ী, মুসলিমের সংখ্যা প্রায় দুই বিলিয়ন, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এর ফলে, অনুসারীর সংখ্যার দিক থেকে ইসলাম খ্রিস্টধর্মের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। তবে, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির ভিন্নতা, ধর্মীয় পরিচয় নির্ধারণের বিভিন্ন মানদণ্ড এবং বেশ কয়েকটি দেশে প্রমিত ডেটাবেসের অনুপস্থিতির কারণে এই হিসাবগুলো এক উৎস থেকে অন্য উৎসে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়।

এছাড়াও, কিছু দেশ তাদের সরকারি তথ্যে ধর্মীয় পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করে না, আবার অন্য দেশগুলো পরোক্ষ অনুমানের উপর নির্ভর করে, যার ফলে ফলাফলে বড় ধরনের গরমিল দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে, মুসলিম সংখ্যালঘুসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপনের পদ্ধতিতে রাজনৈতিক বা আদর্শগত বিবেচনার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এই ভিন্নতা বিশেষত আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যেখানে একটি একক সমাজে মুসলিমদের প্রকৃত শতাংশের হিসাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। এটি ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতেও স্পষ্ট, যেখানে অভিবাসনের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং মুসলিমদের বৈচিত্র্যময় জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পটভূমির কারণে সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কখনও কখনও কঠিন হয়ে পড়ে।

মুসলিম সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতির ধরন

বিশ্বজুড়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতিকে তিনটি প্রধান ধরনে ভাগ করা যায়। প্রথম ধরনটিতে সেইসব সংখ্যালঘু অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সমাজে একীভূত হওয়ার উন্নত স্তর অর্জন করেছে। মুসলমানরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং সুস্পষ্ট আইনি অধিকার ভোগ করে, যা তাদের নাগরিকত্বের কাঠামোর মধ্যে থেকে ধর্মীয় পরিচয় বজায় রাখতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় ধরনটিতে সেইসব সংখ্যালঘু অন্তর্ভুক্ত যারা একীভূতকরণ, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বা সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির মতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যদিও এই চ্যালেঞ্জগুলো সরাসরি সংঘাতে রূপ নেয় না। এই সমস্যাগুলো প্রায়শই এমন সমাজে দেখা দেয় যেখানে জাতীয় পরিচয়, অভিবাসন বা ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক চলে।

তৃতীয় ধরনটি সেইসব সংখ্যালঘুদের সাথে সম্পর্কিত যারা তীব্র রাজনৈতিক, জাতিগত বা ধর্মীয় সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে। এই অঞ্চলগুলোতে কিছু মুসলিম গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের চাপ, বাস্তুচ্যুতি বা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়, যা তাদের পরিস্থিতিকে আরও ভঙ্গুর ও জটিল করে তোলে।

অভিবাসন এবং বৈশ্বিক রূপান্তর: সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্ব মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে ইউরোপ, উত্তর

আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাপক অভিবাসনের ঢেউ প্রত্যক্ষ করেছে। এই অভিবাসনের পেছনে যুদ্ধ, রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থনৈতিক সংকট এবং কিছু অঞ্চলে অস্থিতিশীলতার মতো একাধিক কারণ রয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো বৈশ্বিক ভূদৃশ্যকে নতুন রূপ দিতে অবদান রেখেছে। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের উপস্থিতি বাড়ছে, এবং অনেক পশ্চিমা শহর ও সমাজে মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি আরও দৃশ্যমান হচ্ছে।

এই নতুন বাস্তবতা সাংস্কৃতিক একীকরণ এবং ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে এবং বহুসংস্কৃতিবাদের ধারণা ও এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। যেখানে কিছু সমাজ বৈচিত্র্যকে একটি ইতিবাচক উপাদান হিসেবে দেখে যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তি বাড়ায়, সেখানে অন্যরা মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক পরিচয়ের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে।

ইসলামোফোবিয়া এবং ডানপন্থার উত্থান

বিভিন্ন দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুরা ইসলামোফোবিয়ার উত্থান এবং ডানপন্থী ও জনতুষ্টিবাদী আন্দোলনের কারণে ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, গণমাধ্যম এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ঘটনাগুলো আরও তীব্র হয়েছে, যা কিছু ক্ষেত্রে মুসলিমদের সম্পর্কে নেতিবাচক গতানুগতিক ধারণা ছড়াতে ভূমিকা রেখেছে।

এই ঘটনাগুলো কখনও কখনও অভিবাসন, ধর্মীয় প্রতীক বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনায় প্রতিফলিত হয় এবং সামাজিক উত্তেজনার জন্ম দিতে পারে যা একীকরণ ও সহাবস্থানের সুযোগকে প্রভাবিত করে। তবে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি, জনস্বাধীনতার স্তর এবং সমাজে বহুত্ববাদের সংস্কৃতি কতটা প্রোথিত, তার উপর নির্ভর করে এই ঘটনাগুলোর তীব্রতা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হয়। ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমান বৈশ্বিক রূপান্তর ইঙ্গিত দেয় যে আগামী বছরগুলোতে মুসলিম সংখ্যালঘুরা পরিচয়, নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক একীকরণের সাথে সম্পর্কিত জটিল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে থাকবে। অধিকন্তু, মুসলিম বিশ্বের কিছু অংশে চলমান রাজনৈতিক সংকট অভিবাসনের আরও ঢেউ সৃষ্টি করতে পারে, যা ফলস্বরূপ আশ্রয়দাতা দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করবে।

বিপরীতভাবে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা মুসলিম সংখ্যালঘুদের তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উপস্থিতি শক্তিশালী করার এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নতুন সুযোগ করে দেয়, যা তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং তাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে আরও কার্যকরভাবে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে।

এই গবেষণা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে বিশ্বজুড়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বাস্তবতা উচ্চ মাত্রার বৈচিত্র্য এবং জটিলতা দ্বারা চিহ্নিত, এবং এটিকে কোনো একক মডেল বা একীভূত ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। মুসলিম সংখ্যালঘুরা কোনো সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়; বরং, তাদের পরিস্থিতি একাধিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত, যা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্ন হয়। এই ঘটনাটি বোঝার জন্য এমন সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও প্রয়োজন, যা সাধারণীকরণ ও পূর্বধারণার ঊর্ধ্বে উঠে বিভিন্ন স্তরে দ্রুত পরিবর্তনশীল এক বিশ্বে ধর্মীয় পরিচয় এবং একীকরণ ও নাগরিকত্বের চাহিদার মধ্যকার পরিবর্তনশীল মিথস্ক্রিয়াকে বিবেচনায় নেয়।■

কাবা শরিফের দরজার ইতিহাস

ফাতিমা তানিম রুকনউদ্দিন, পিএইচডি
ভারত

কাবা শরিফ ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র ও সম্মানিত স্থান। বিশ্বের প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমানের জন্য এটি তাদের ঈমান, ইবাদত ও হজের কেন্দ্রবিন্দু। মুসলমানরা তাদের দৈনন্দিন নামাজ আদায়ের সময় কাবার দিকেই মুখ করে দাঁড়ান–যা কিবলা নামে পরিচিত। এছাড়া তারা তাওয়াফ নামক ইবাদতের অংশ হিসেবে কাবাকে প্রদক্ষিণ করেন, যা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা একটি ধর্মীয় অনুশীলন।

মক্কার মসজিদুল হারামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কাবা শরিফকে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাইতুল আতিক (প্রাচীন গৃহ), বাইতুল হারাম (পবিত্র গৃহ) এবং বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর)। এটি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইবাদতের স্থান হিসেবে বিবেচিত, যা মূলত হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) নির্মাণ করেছিলেন। প্রায় ৫,০০০ বছর আগে হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) একই ভিত্তির ওপর এটি পুনর্নির্মাণ করেন, যার ফলে আজ যে স্থাপনাটি বিদ্যমান, তা গড়ে ওঠে।

পবিত্র কুরআনে কাবা শরিফের গুরুত্ব বিভিন্ন আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

"নিশ্চয়ই মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর (ইবাদতের জন্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হলো বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত, যা বরকতময় এবং সমগ্র বিশ্বজগতের (মানুষ ও জিনের) জন্য হিদায়াতস্বরূপ।" – সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৬

"আর স্মরণ করো, যখন আমি ইবরাহিমকে পবিত্র গৃহের (মক্কার কাবার) স্থান নির্দেশ করেছিলাম।" – সুরা আল-হাজ্জ, আয়াত ২৬

"এবং তারা যেন প্রাচীন গৃহের (মক্কার কাবার) তাওয়াফ করে।" – সুরা আল-হাজ্জ, আয়াত ২৯; উল্লেখ্য, এ আয়াতটি অনেক সময় আলে ইমরানের আলোচনার সঙ্গেও উদ্ধৃত করা হয়।

এই আয়াতগুলো কাবা শরিফের প্রাচীন পবিত্রতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম আবির্ভাবের আগেও আরব উপদ্বীপের মানুষ কাবাকে অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত স্থান হিসেবে শ্রদ্ধা করত।

ইসলামে কাবা শরিফকে আল্লাহর অন্যতম মহান শাআইর বা নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাকওয়া ও পরহেজগারির পরিচায়ক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, নিশ্চয়ই তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই উৎসারিত।" – সুরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৩২

ইতিহাসজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন বন্যা) এবং বিভিন্ন মানবসৃষ্ট ঘটনার কারণে কাবা শরিফ একাধিকবার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছে, যার ফলে এটি বর্তমান রূপ লাভ করেছে। বিভিন্ন যুগের রাজা ও শাসকগণ কাবার রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। তাঁরা কাবার গিলাফ (কিসওয়া) প্রদান করেছেন, এর আংশিক বা পূর্ণ পুনর্নির্মাণ করেছেন এবং এর বিভিন্ন উপাদান নির্মাণ ও সংরক্ষণ করেছেন–স্বর্ণের মিজাব (পানি নিষ্কাশনের নালা) থেকে শুরু করে পূর্ব দেয়ালে অবস্থিত দৃষ্টিনন্দন অলংকৃত দরজা পর্যন্ত।

কাবা শরিফের দরজার দেখভাল ও নির্মাণের দায়িত্ব পালন করা সবসময়ই এক বিরাট সম্মান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শাসকরা নিশ্চিত করতেন যে, এর কাজে শুধুমাত্র সর্বোত্তম কারিগর, নকশাবিদ ও ক্যালিগ্রাফাররা নিয়োজিত থাকবেন। আধুনিক সৌদি যুগে, উদাহরণস্বরূপ, কাবার পূর্ববর্তী ও বর্তমান দরজাটি মক্কার খ্যাতনামা স্বর্ণকার পরিবার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল–প্রথমে শেখ ইব্রাহিম বদর এবং পরে তাঁর পুত্র শেখ আহমদ বিন ইব্রাহিম বদর ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে। বর্তমান দরজাটির নকশা প্রণয়ন করেছিলেন প্রখ্যাত সিরীয় প্রকৌশলী মুনীর সাররি আল-জুন্দি, যিনি ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্তেকাল করেন।

যদিও বর্তমানে টিকে থাকা এবং নির্ভুলভাবে তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব এমন সবচেয়ে প্রাচীন কাবা শরিফের দরজাটি উসমানীয় সুলতান চতুর্থ মুরাদের যুগের, তবে ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, এর পূর্বে অন্তত আরও তিনটি দরজা বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন দরজাসমূহ ও ঐতিহ্য

ইসলামি ঐতিহ্য অনুযায়ী, হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) কাবা শরীফকে একটি সাধারণ আয়তাকার স্থাপনা হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন, যার কোনো দরজা বা ছাদ ছিল না। এতে পূর্ব দেয়ালে একটি প্রবেশপথ এবং পশ্চিম দেয়ালে একটি বহির্গমনপথ ছিল। কালো পাথর (হাজরে আসওয়াদ) একটি কোণে স্থাপন করা হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মক্কার শাসক গোত্রগুলো একাধিকবার এটি পুনর্নির্মাণ করেছে।

ঐতিহাসিক ইবন হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং আল-

আজরাকি (মৃত্যু ৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর কিতাব আখবার মাক্কাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কাবার প্রথম পরিচিত দরজাটি স্থাপন করেছিলেন ইয়েমেনের রাজা তুব্বা (মৃত্যু আনুমানিক ৪৩০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মের পূর্বে মক্কা সফর করেছিলেন। বর্ণনা অনুযায়ী, তুব্বা কাবাকে আবৃত করেছিলেন, জুরহুম গোত্রকে এর পরিচ্ছন্নতা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং একটি চাবিসহ দরজা স্থাপনের আদেশ দিয়েছিলেন। এই কাঠের দরজাটি জাহেলি যুগ এবং ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল।

৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পর কুরাইশ গোত্র কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণ করে। পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে তারা এর আকার কিছুটা ছোট করে, নিম্ন অর্ধবৃত্তাকার প্রাচীর (হাতীম) সংযোজন করে এবং পূর্ব দিকের দরজাটি ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে স্থাপন করে। একই সঙ্গে পশ্চিম দিকের প্রস্থানপথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে কাবার আকৃতি দীর্ঘায়ত (আয়তাকার) রূপ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনকাকৃতির (কিউবিক) রূপ ধারণ করে।

৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে (৬৪ হিজরি) খলিফা আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কাবা শরীফকে হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর মূল পরিমাপে পুনঃস্থাপন করেন। তিনি দরজাটি ভূমি সমতলে নামিয়ে আনেন এবং পশ্চিম দিকের প্রস্থানপথ পুনরায় খুলে দেন। পরে ৬৯২ খ্রিস্টাব্দে (৭৩ হিজরি) উমাইয়া পুনর্দখলের পর কাবা শরীফকে

বর্তমান দরজাটি ১৯৭৯ সালের ১৩ অক্টোবর সৌদি আরবের বাদশাহ খালিদ বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের শাসনামলে স্থাপন করা হয়। ১৯৭৬-১৯৭৭ সালে কাবার ভেতরে নামাজ আদায় করার সময় তিনি বিদ্যমান দরজাটিতে আঁচড় ও ক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করেন। এরপর তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে একটি নতুন দরজা তৈরির নির্দেশ দেন এবং উত্তরের দিকে ছাদে প্রবেশের জন্য একটি দরজা (বাব আল-তাওবা) তৈরিরও নির্দেশ দেন

আবার কুরাইশদের নির্ধারিত পরিমাপে পুনর্নির্মাণ করা হয়। তখন দরজাটি পুনরায় উঁচু করা হয় এবং পশ্চিম দিকের প্রবেশপথটি আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধারণা করা হয়, এই গোপন দরজা'র কিছু অবশিষ্টাংশ বর্তমানে কয়েকটি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

উসমানীয় যুগের দরজা (সুলতান চতুর্থ মুরাদ)

বর্তমানে সুনির্দিষ্টভাবে তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব এমন সবচেয়ে প্রাচীন কাবার দরজাটি উসমানীয় সুলতান চতুর্থ মুরাদ-এর শাসনামলে স্থাপন করা হয়েছিল। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রবল বর্ষণের ফলে কাবা শরীফ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর পূর্ব ও পশ্চিম দেয়াল ধসে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মিসরীয় কারিগররা ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে (১০৩৯ হিজরি) কাজ শুরু করেন এবং ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে (১০৪০ হিজরি) তা সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে দরজাটি আনুমানিক ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে (১০৪৫ হিজরি) স্থাপন করা হয়।

এটি দুটি প্যানেলে বিভক্ত ছিল এবং এতে জ্যামিতিক নকশা খোদাই করা ছিল। দরজাটি ১৬৬ পাউন্ড রৌপ্য দ্বারা আবৃত ছিল, যার ওপর স্বর্ণপাতা ও টেকসই ধাতব পাতের প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল প্রথম কাবার দরজা যেখানে রৌপ্য ও স্বর্ণকে উল্লেখযোগ্যভাবে একত্রে ব্যবহার করা হয়। এই দরজাটি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তিন শতাধিক বছর ধরে টিকে ছিল।

এই ঐতিহাসিক দরজাটি এখন প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে রয়েছে, যার মধ্যে আবুধাবির লুভর আবুধাবিতে "রোডস টু অ্যারাবিয়া" প্রদর্শনীও অন্তর্ভুক্ত, যা রিয়াদের জাতীয় জাদুঘর থেকে ধার নেওয়া হয়েছে।

বাদশাহ আবদুলআজিজ আল সৌদের শাসনামল

১৯৪৪ সালে আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুলআজিজ বিন আবদুর রহমান আল সৌদ জানতে

পারেন যে পুরোনো দরজাটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এরপর তিনি একটি নতুন দরজা তৈরির নির্দেশ দেন। তাঁর নিজের অর্থে তৈরি এই দরজাটি অ্যালুমিনিয়ামের কাঠামো দিয়ে নির্মিত ছিল, যা লোহার দ- দিয়ে আরও শক্তিশালী করা হয়েছিল এবং সোনার প্রলেপযুক্ত রৌপ্য পাত দিয়ে আবৃত ছিল। এতে আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ খোদাই করা ছিল। এতে একটি ধাতব ভিত্তি ছিল এবং জাভানিজ সেগুন কাঠের দুটি কাঠের পাল্লা যুক্ত ছিল, পাশাপাশি এতে ১৮৯১ সালের একটি তালাও সংরক্ষিত ছিল।

খ্যাতনামা মক্কার স্বর্ণকার শেখ ইব্রাহিম বদর এই কাজের নেতৃত্ব দেন, যা সম্পন্ন হতে তিন বছর সময় লাগে। ১৯৪৭ সালের ৩১ অক্টোবর এটি স্থাপন করা হয় এবং প্রায় ৩০ বছর ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এটি মক্কায় অবস্থিত দুই পবিত্র মসজিদের স্থাপত্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত রয়েছে।

বর্তমান কাবা দরজা

বর্তমান দরজাটি ১৯৭৯ সালের ১৩ অক্টোবর সৌদি আরবের বাদশাহ খালিদ বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের শাসনামলে স্থাপন করা হয়। ১৯৭৬-১৯৭৭ সালে কাবার ভেতরে নামাজ আদায় করার সময় তিনি বিদ্যমান দরজাটিতে আঁচড় ও ক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করেন। এরপর তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে একটি নতুন দরজা তৈরির নির্দেশ দেন এবং উত্তরের দিকে ছাদে প্রবেশের জন্য একটি দরজা (বাব আল-তাওবা) তৈরিরও নির্দেশ দেন।

বদর পরিবার–শেখ আহমদ বিন ইব্রাহিম বদরের নেতৃত্বে, তাঁর আত্মীয় মাহমুদ ও ইব্রাহিম বদরসহ–এটি একটি নিবেদিত কর্মশালায় নির্মাণ করে। প্রকৌশলী মুনির সারি আল-জুন্দি এটি নকশা করেন।

এর উচ্চতা ৩ মিটার, প্রস্থ ২ মিটার এবং গভীরতা ০.৫ মিটার। দরজাটি ২.৫ সেন্টিমিটার পুরু অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি, যা সোনায় ডুবানো রৌপ্য পাত দিয়ে আবৃত। এর ভিত্তি থাইল্যান্ডের বিরল মাকা মুঙ কাঠ দিয়ে তৈরি। এতে ২৮০ কেজিরও বেশি খাঁটি সোনা ব্যবহার করা হয়েছে–যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম একক স্বর্ণ ব্যবহারের উদাহরণ–এবং এতে আল্লাহর ৯৯ নামের মধ্যে ১৫টি সুলুস ক্যালিগ্রাফিতে অলংকৃত রয়েছে, পাশাপাশি এতে কুরআনের আয়াত, ইসলামিক বাক্যাংশ এবং ঐতিহাসিক নোটসহ বৃত্তাকার প্যানেলও সংযোজিত রয়েছে।

প্রধান কুরআনিক শিলালিপিসমূহ হলো:

"আল্লাহর নামে, যিনি পরম দয়ালু, অতি করুণাময়।"

"তোমরা এতে প্রবেশ করো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে।" – সূরা আল-হিজর, আয়াত ৪৬

"আল্লাহ কাবাকে, পবিত্র গৃহকে, মানবজাতির জন্য নিরাপত্তা ও কল্যাণের আশ্রয়স্থল করেছেন..." – সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৯৭

"আর বলো: 'হে আমার প্রভু! আমার প্রবেশকে উত্তম করো এবং আমার প্রস্থানকেও উত্তম করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্য করার জন্য একটি শক্তি দান করো।'" – সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮০

"...তোমার প্রভু নিজের ওপর দয়া লিখে নিয়েছেন (নির্ধারণ করেছেন)..." (সূরা আল-আনআম, আয়াত ৫৪)

"আর তোমার প্রভু বলেছেন: 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব...'" – সূরা গাফির, আয়াত ৬০

"বলো: 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করেন। তিনি অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু!'" – সূরা আয-যুমার, আয়াত ৫৩

ইসলামে কাবার দরজার নিজস্ব কোনো পৃথক ধর্মীয় গুরুত্ব নেই; এটি কেবল পবিত্র স্থাপনার অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়। এর মহিমা মূলত আল্লাহর ঘর কাবার গৌরব ও পবিত্রতারই প্রতিফলন। কাবার ইতিহাসে প্রতিটি দরজাই ভক্তি, নিষ্ঠা এবং কারিগরি দক্ষতার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বহন করে। ■

ইসলামে গণতন্ত্র

তৌসিফ আহমদ পাররে, পিএইচডি
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ভারত

মূল ভাবনা:

ইসলামের কিছু মৌলিক রাজনৈতিক ধারণা ও মূল্যবোধের সমসাময়িক বা পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে অধিকাংশ মুসলিম বুদ্ধিজীবী দাবি করেন যে–ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার অন্যতম বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয় হলো–ইসলাম ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যতা। এখানে আমি একবিংশ শতাব্দীর এই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে কিছু তাত্ত্বিক আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

আজকের মুসলিম বিশ্বের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে জরুরি, গুরুতর এবং জটিল প্রশ্নগুলোর একটি হলো–ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কেমন, কিংবা ইসলামের শিক্ষার সাথে গণতান্ত্রিক নীতিমালার সহাবস্থান সম্ভব কি না। বিষয়টি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত ও সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। বিশেষ করে নাইন-ইলেভেন (৯/১১)-এর ঘটনা এবং তৎপরবর্তী 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ'-এর পর এই আলোচনা নতুন গতি পায়।

৯/১১-পরবর্তী বিশ্বে ইসলামকে প্রায়শই একটি 'সহিংস' ও 'সন্ত্রাসবাদী' ধর্ম হিসেবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে; দাবি করা হয়েছে যে–শান্তি, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, পরমতসহিষ্ণুতা, বহুত্ববাদ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এই নেতিবাচক প্রচারণা মুসলিম বিশ্ব এবং এর বাইরে ইসলামিক শিক্ষার সাথে গণতান্ত্রিক নীতির সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে 'আরব বসন্ত' (Arab Spring)-এর মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলো মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা (MENA), দক্ষিণ এশিয়া এবং পশ্চিমা বিশ্বসহ গোটা পৃথিবীর জনপরিসরে আলোচনার মূল কেন্দ্রে চলে আসে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাত্ত্বিক বিবর্তন

যদি আমরা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তাকাই, তবে দেখব 'ইসলামিক গণতন্ত্র' (Islamic Democracy) এবং 'আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র' (Spiritual Democracy)-এর মতো পরিভাষাগুলো যথাক্রমে আবুল কালাম আজাদ (মৃত্যু: ১৯৫৮) এবং আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (মৃত্যু: ১৯৩৮) তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যবহার করেছিলেন।

পরবর্তীতে প্রখ্যাত ফকিহ ও মুফাসসির মুফতি মুহাম্মদ শফি (মৃত্যু: ১৯৭৬)-এর লেখায়–বিশেষ করে পবিত্র কোরআনের সূরা আলে-ইমরানের ১৫৯ নম্বর আয়াত এবং সূরা আশ-শূরার ৩৮ নম্বর আয়াতের (যা পারস্পরিক পরামর্শ বা 'শূরা' সম্পর্কিত) তাফসিরে এই আলোচনার বিস্তার দেখা যায়। এরপর আমিন আহসান ইসলাহী (মৃত্যু: ১৯৯৭)-এর তাফসির এবং মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (মৃত্যু: ১৯৭৯)-এর চিন্তাধারায় এই রাজনৈতিক

দর্শন আরও বিকশিত হয়। মাওলানা মওদুদী এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন এবং ইসলাম ও গণতন্ত্রের এই মিশ্রণকে বোঝাতে 'থিও-ডেমোক্রেসি' (Ilahi Jumhuri Hukumat) পরিভাষাটি তৈরি করেন। তাঁর যুক্তি ছিল—ইসলাম পুরোপুরি থিওক্রেসি (ধর্মতন্ত্র) বা পশ্চিমা গণতন্ত্র কোনোটিই নয়, বরং এতে উভয়েরই কিছু উপাদান বিদ্যমান।

উদাহরণস্বরূপ, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯১২ সালে তাঁর 'আল-হিলাল' পত্রিকায় ইসলামিক গণতন্ত্র এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবোত্তর সংবিধানের মধ্যকার সাদৃশ্য নিয়ে লিখেছিলেন। তিনি মনে করতেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক শাসনব্যবস্থাই হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ। একে তিনি 'ইসলামিক গণতন্ত্র' বলে অভিহিত করেন, যার কোরআনিক প্রতিশব্দ হলো 'শূরা'। আজাদের মতে, ইসলাম মূলত গণতন্ত্র ও সাম্যের মূল স্পিরিটের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায় এবং ইসলাম এমন কোনো সরকারকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূল মনে করে না যা সংসদীয় ও সাংবিধানিক নয়।

অনুরূপভাবে, মধ্যপ্রাচ্যে জামাল উদ্দিন আফগানি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এবং 'প্রজাতান্ত্রিক সরকার'-এর পক্ষে কলম ধরেন। তাঁর অনুসারী ও সহকর্মী মুহাম্মদ আবদুহ এবং রশিদ রিদা 'শূরা' ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং একে ধীরে ধীরে সংসদীয় গণতন্ত্রে রূপান্তরের ওপর জোর দেন। একই সাথে তাঁরা 'ইজতিহাদ' (স্বাধীন গবেষণামূলক চিন্তাধারা) এবং 'মাসলাহা' (জনকল্যাণ)-এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সমসাময়িক বিতর্ক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মুসলিম পণ্ডিতরা ইসলামিক গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি দিয়ে আসলেও, অধ্যাপক নোয়াহ ফেল্ডম্যানের মতে, এই পরিভাষাটি মূলত ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে ব্যাপক পরিচিতি পায়। তাঁর মতে, ইসলাম ও গণতন্ত্র নীতিগত বা ব্যবহারিক দিক থেকে খাপ খায় কি না—সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এখন আর কেবল তাত্ত্বিক বা আঞ্চলিক আগ্রহের বিষয় নয়। ১৯৯০ সালে আলজেরিয়ার নির্বাচনে ইসলামপন্থীদের সাময়িক বিজয়ের পর থেকে এই বিষয়টি অসংখ্য আরবি বই, প্রবন্ধ এবং ফতোয়ায় আলোচিত হয়েছে। এখানে ফাতেমা মেরনিসির ১৯৯২ সালের গ্রন্থ 'Islam and Democracy: Fear of the Modern World' অথবা জন এল. এস্পোসিটো এবং জন ও. ভলের ১৯৯৬ সালের গ্রন্থ 'Islam and Democracy'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য, এমন অনেক লেখক ও গবেষক আছেন যারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে এই দুটি ব্যবস্থা পরস্পরবিরোধী। তবে সাম্প্রতিক অতীতে মুসলিম ও পশ্চিমা উভয় ধারার গবেষকদের বৈচিত্র্যময় মতামত এই বিতর্ককে অনেক সমৃদ্ধ করেছে।

ইসলামিক ঐতিহ্যের মূল উৎস (কোরআন ও সুন্নাহ)-এ বিদ্যমান বেশ কিছু ধারণা ও আইনি নীতিমালাকে আধুনিক গবেষকরা ইসলামের ভেতর গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনে ব্যবহার করছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- খিলাফত (Khilafah) ও বায়াত (Baya'h - আনুগত্যের শপথ)
- শূরা (Shura - পারস্পরিক পরামর্শ)
- ইজমা (Ijma - ঐকমত্য) ও ইজতিহাদ (Ijtihad)
- মাসলাহা (Maslaha - জনকল্যাণ)
- স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকার এবং পরমতসহিষ্ণুতার মতো মৌলিক মূল্যবোধ।

এসবের ওপর ভিত্তি করেই তারা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা, প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন এবং ধর্মীয় সংস্কারের একটি ইসলামিক রূপরেখা তৈরি করতে চান।

সামঞ্জস্যতার ভিত্তি: প্রক্রিয়া বনাম চেতনা

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে একঝাঁক প্রখ্যাত মুসলিম ও অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ইসলাম ও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্যতার পক্ষে কাজ করছেন—যদিও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার পরিধি ভিন্ন। এই তালিকায় রয়েছেন জন এস্পোসিটো, জন ভল, ডেল আইকেলম্যান, জেমস পিসকাটোরি, নোয়াহ ফেল্ডম্যান, আবদুল আজিজ সাচেদিনা, আসিফ বায়াত, খালেদ আবু এল ফাদল, আবদেলওয়াহাব এল-আফেন্দী, আবদু ফিলালি-আনসারি, এম. এ. মুক্তেদার খান এবং নাদের হাশেমী প্রমুখ।

তাঁদের আলোচনার সারকথা হলো—ইসলামে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনার অর্থ এই নয় যে 'ডেমোক্রেসি' শব্দটি সরাসরি কোরআন বা সুন্নাহর কোনো পরিভাষা। বরং এর অর্থ হলো, ইসলামের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে এমন কিছু আদর্শ, মূল ধারণা এবং মূল্যবোধ রয়েছে যা আধুনিক গণতান্ত্রিক নীতিমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাঁদের মতে, কেবল বাহ্যিক 'প্রক্রিয়া' বা কাঠামোর দিকে না তাকিয়ে যদি গণতন্ত্রের আসল 'চেতনা' বা স্পিরিট বিবেচনা করা হয়, তবে ইসলাম ও গণতন্ত্রের সম্পর্কটি পশ্চিমা মানদণ্ডেও কোনো সহজাত দ্বন্দ্ব তৈরি করে না। তবে একই সাথে, কোনো গবেষকই পশ্চিমা গণতন্ত্রকে 'হুবহু অন্ধ অনুকরণের' পক্ষে নন; কারণ ইসলাম ও পশ্চিমা সেক্যুলার গণতন্ত্রের মধ্যে কিছু মৌলিক ও গভীর পার্থক্য রয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ গবেষক ইসলাম ও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্যতার পক্ষে জোরালো মত দেন, তবে এই দুইয়ের সমন্বিত রূপটিকে ঠিক কী নামে ডাকা হবে—তা নিয়ে এখনো কোনো একক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। কেউ একে সহজ কথায় বলেন 'ইসলামিক গণতন্ত্র' (Islamic Democracy), কেউ বলেন 'শূরাতন্ত্র' (Shuracracy), কেউ নাম দিয়েছেন 'ঐশ-গণতন্ত্র' (Theo-democracy), আবার কেউ বলেন 'ইসলামিক গণতান্ত্রিক সরকার'। পরিভাষার এই বৈচিত্র্যময় তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। ■

দায়িত্বশীল ও নৈতিক গণমাধ্যমের সনদ

ডিজিটাল যুগের জন্য ২০১১ সালের মক্কা-জাকার্তা ইসলামিক মিডিয়া ঘোষণার দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্নবীকরণ

আল-উম্মাহ রিপোর্ট

ভূমিকা : কেন এই সনদটি আজও গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যাপক ব্যবহার, ডিজিটাল বিভাজন, ভুয়া তথ্যের ছড়াছড়ি, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, অ্যালগরিদম-নির্ভর প্রভাব বিস্তার এবং গণমাধ্যমের প্রতি মানুষের আস্থার অবক্ষয়ের এই যুগে দায়িত্বশীল ও নৈতিক যোগাযোগের প্রয়োজন আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে।

এক দশকেরও বেশি সময় আগে, মুসলিম স্কলার, গণমাধ্যম পেশাজীবী এবং বুদ্ধিজীবীরা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ এবং ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জাকার্তায় একত্রিত হন। সেখানে তারা মানবিক মর্যাদা, সত্যনিষ্ঠা, মধ্যপন্থা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে নৈতিক গণমাধ্যম চর্চার একটি নীতিনির্ভর কাঠামো প্রণয়ন করেন।

যদিও এই মূল ঘোষণাটি ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তবুও এর মৌলিক উদ্বেগগুলো আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এর মধ্যে রয়েছে উগ্রবাদ ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের বিস্তার, ধর্ম ও পরিচয়ের অপব্যবহার করে রাজনীতি করা, জনমতকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করার প্রবণতা, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর আঘাত, সমাজে ক্রমবর্ধমান বিভাজন, এবং নৈতিক সাংবাদিকতা ও দায়িত্বশীল ডিজিটাল যোগাযোগের জরুরি প্রয়োজন।

একইসঙ্গে, এর কিছু ভাষা ও উপস্থাপন সেই সময়ের রাজনৈতিক ও গণমাধ্যম-সংক্রান্ত আলোচনার প্রতিফলন বহন করে। বর্তমান সংশোধিত সংস্করণটি এই ঘোষণার মূল চেতনা ও মৌলিক নীতিগুলো সংরক্ষণ করে, তবে সেগুলোকে আজকের আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বের উপযোগী করে সমকালীন, ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈশ্বিকভাবে

প্রাসঙ্গিক ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে।

এই নবায়িত সনদটি পেশাদারিত্ব, মানবিক মর্যাদা, দায়িত্বের সঙ্গে স্বাধীনতা, আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া, সামাজিক ঐক্য, তথ্যগত নির্ভুলতা এবং মানবজাতির অভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি গঠনমূলক সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

দায়িত্বশীল ও নৈতিক গণমাধ্যমের সনদ

(ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক মিডিয়া বিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত – ডিসেম্বর ২০১১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক; এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যা ন্যায়বিচার, প্রজ্ঞা, সত্যনিষ্ঠা, করুণা ও শিষ্টাচারপূর্ণ সংলাপের আহ্বান জানায়, এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও জনচেতনা গঠনে গণমাধ্যমের গভীর প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে, এই সনদটি দায়িত্বশীল গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা নির্ধারণ করে।

এই সনদটি স্বীকার করে যে গণমাধ্যম কেবল তথ্যের একটি মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি আমানত এবং জনসাধারণের প্রতি একটি দায়িত্ব, যা শান্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে পারে অথবা বিভাজন ও সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে, গণমাধ্যম পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নোক্ত নীতি ও দায়িত্বসমূহ পালনের অঙ্গীকার করে :

১. মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্য

১. মানবিক মর্যাদা ও নৈতিক দায়বদ্ধতা: গণমাধ্যমকে মানবিক মর্যাদা, নৈতিক দায়িত্ব, সহানুভূতি ও ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখতে হবে, যা দয়া, শ্রদ্ধা ও সত্যের সর্বজনীন মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে।

২. সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের সুরক্ষা: গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে হবে; একই সঙ্গে গঠনমূলক বৈশ্বিক সম্পৃক্ততা ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।

৩. মধ্যপন্থা ও প্রজ্ঞার প্রসার: গণমাধ্যমের বক্তব্য ও উপস্থাপনা এমন হতে হবে, যা ভারসাম্য, প্রজ্ঞা, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্যদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করে; উগ্রতা, ঘৃণা ও বিভাজনকে পরিহার করতে হবে।

৪. সত্য ও নির্ভুলতার প্রতি অঙ্গীকার: গণমাধ্যম পেশাজীবীদের তথ্য সৎ, নির্ভুল ও স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং পেশাগত নীতি ও যাচাইকৃত তথ্য অনুসরণ করতে হবে।

৫. দায়িত্বশীল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা: মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার, তবে তা দায়িত্বশীলভাবে প্রয়োগ করতে হবে–জনস্বার্থ, নৈতিক মানদ-, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে।

২. অধিকার ও পেশাগত নিশ্চয়তা

১. দায়িত্বশীল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা: গণমাধ্যম পেশাজীবীদের অধিকার রয়েছে দায়িত্বশীল ও নৈতিকভাবে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার, যাতে তারা কোনো ধরনের ভীতি প্রদর্শন বা অবৈধ বিধিনিষেধের শিকার না হন।

২. তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার: সমাজের মানুষের নির্ভরযোগ্য তথ্য, স্বচ্ছতা এবং জনকল্যাণে নিবেদিত দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার অধিকার রয়েছে।

৩. সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা: গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য নিরাপদ ও ন্যায্য কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে সংঘাত, সংকট এবং মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে–যা আন্তর্জাতিক মানদ-অনুযায়ী হবে।

৩. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বসমূহ

১. বোঝাপড়া ও সংলাপের প্রসার: গণমাধ্যমকে জনগণ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতে উৎসাহিত করতে হবে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অবদান রাখতে হবে।

২. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ: গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও ভাষাগত ঐতিহ্যের মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করতে হবে, যার মধ্যে আরবি ভাষাও অন্তর্ভুক্ত–যা কুরআনের ভাষা এবং ইসলামি সভ্যতার অংশ।

৩. সামাজিক ঐক্যকে সমর্থন: গণমাধ্যমকে সামাজিক সংহতি জোরদার করতে হবে এবং বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, গোত্রবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ এবং সব ধরনের বৈষম্যকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৪. উগ্রবাদ ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রতিরোধ: গণমাধ্যমকে সব ধরনের সহিংসতা, সন্ত্রাসবাদ, উসকানি, ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং মতাদর্শগত উগ্রবাদ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৫. উন্নয়ন ও জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করা: গণমাধ্যমকে শিক্ষা, উদ্ভাবন, মানব উন্নয়ন এবং গঠনমূলক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে হবে।

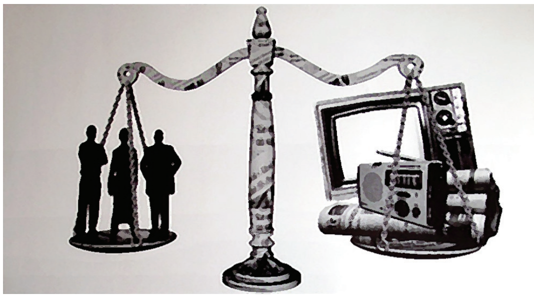

গণমাধ্যম পেশাজীবীদের ডিজিটাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দায়িত্বশীলভাবে অংশ নিতে হবে এবং ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা ও অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে হবে

”

৪. গণমাধ্যম পেশাজীবীদের নৈতিক দায়িত্বসমূহ

১. ধর্ম ও পবিত্র মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা: গণমাধ্যম পেশাজীবীদের এমন কোনো বিষয়বস্তু পরিহার করতে হবে যা ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্ম, পবিত্র প্রতীক বা সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের অবমাননা করে; তবে ন্যায্য ও গঠনমূলক সমালোচনার পেশাগত মান বজায় রাখতে হবে।

২. সহিংসতা ও উসকানি প্রত্যাখ্যান: গণমাধ্যম কখনোই সহিংসতা, ঘৃণা, সন্ত্রাসবাদ বা সামাজিক অস্থিরতা প্রচার করবে না; পাশাপাশি ধর্ম বা পরিচয়কে রাজনৈতিক স্বার্থে বিভাজন বা প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহার করতে দেবে না।

৩. তথ্যের নির্ভুলতা ও যাচাই: সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে, ভুয়া তথ্য ও গুজব এড়িয়ে চলতে হবে এবং তথ্য, মতামত ও প্রচারণার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখতে হবে।

৪. তথ্য সংগ্রহের নৈতিক পদ্ধতি: তথ্য সংগ্রহ করতে হবে আইনসঙ্গত ও নৈতিক উপায়ে; কোনো ধরনের জবরদস্তি, ব্ল্যাকমেইল, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা গোপনীয়তার লঙ্ঘন করা যাবে না।

৫. সততা ও পেশাদারিত্ব: গণমাধ্যম পেশাজীবীদের সেনসেশন সৃষ্টি, বানানো গল্প, বিভ্রান্তিকর শিরোনাম এবং শুধুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ বা ভয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে করা তথ্য বিকৃতি পরিহার করতে হবে।

৬. শিষ্টাচারপূর্ণ জনআলোচনা: গণমাধ্যমে ব্যবহৃত ভাষা হতে হবে ভদ্র, শ্রদ্ধাশীল ও পেশাদার; মানহানি, ব্যক্তিগত আক্রমণ, অশ্লীলতা, অপমান বা ক্ষতিকর গুজব প্রচার করা যাবে না।

৭. শিশু ও পরিবারের সুরক্ষা: গণমাধ্যমকে শিশু ও তরুণদের এমন সব ক্ষতিকর বিষয়বস্তু থেকে রক্ষা করতে হবে, যা তাদের নৈতিক, মানসিক বা শারীরিক কল্যাণকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

৮. নৈতিক বিজ্ঞাপন: বিজ্ঞাপনে এমন কোনো পণ্য বা আচরণ প্রচার করা যাবে না যা ক্ষতিকর, শোষণমূলক, প্রতারণামূলক বা সামাজিকভাবে ধ্বংসাত্মক; পাশাপাশি সম্পাদকীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখতে হবে।

৯. ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা: গণমাধ্যমকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং বিদ্রুপ, স্টেরিওটাইপ বা বৈষম্যমূলক উপস্থাপন এড়িয়ে চলতে হবে।

১০. দায়িত্বশীল ডিজিটাল যোগাযোগ: গণমাধ্যম পেশাজীবীদের ডিজিটাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দায়িত্বশীলভাবে অংশ নিতে হবে এবং ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা ও অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে হবে।

১১. বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান: বিচারাধীন মামলার বিষয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এমন হতে হবে যাতে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত না হয় বা বিচারিক ব্যবস্থার ওপর অন্যায় প্রভাব না পড়ে।

১২. উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি: গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবকল্যাণ ও নৈতিক যোগাযোগের স্বার্থে নতুন প্রযুক্তি, ডিজিটাল মাধ্যম ও মাল্টিমিডিয়া উদ্ভাবনকে দায়িত্বশীলভাবে গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

এই সনদটি সত্য, দায়িত্বশীলতা, মধ্যপন্থা, পেশাদারিত্ব এবং মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে নৈতিক গণমাধ্যমের প্রতি এক নবায়িত আহ্বানকে উপস্থাপন করে।

বিশ্ব যখন অভূতপূর্ব যোগাযোগ-সংকটের মুখোমুখি, তখন নৈতিক গণমাধ্যমকে বিভাজনের পরিবর্তে শান্তির শক্তি, বিভ্রান্তির পরিবর্তে জ্ঞানের বাহক এবং ঘৃণার পরিবর্তে মানবিক বোঝাপড়ার মাধ্যম হয়ে উঠতে হবে।

এই সনদের স্থায়ী বার্তা হলো—দায়িত্বশীল গণমাধ্যম ন্যায়বিচার, সহাবস্থান, সহমর্মিতা এবং অভিন্ন মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ■